সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৫

গ্রাহক পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।] [মফস্বলে ৩।৶০ তিন টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

কলিকাতা ২২নং স্মুকিয়া, ষ্ট্রীট্ সিদ্ধেশ্বর প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্রমণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

পঞ্চত্রিংশ ভাগের সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[পঞ্চত্রিংশ ভাগ]

সভাপতির অভিভাষণ*

ভারতবর্ষের ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ করা উচিত ?

ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না, ইংরাজ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইতিহাস লেখা ইংরাজদের একটা স্বভাব, স্বভাবটা ভাল। গোড়ার খবর না জান্‌লে বর্ত্তমানও বোঝা যায় না, ভবিষ্যৎ কি হবে, তাহাও ধরা যায় না। সুতরাং গোড়ার খবর রাখার ইচ্ছাটা মানুষের স্বাভাবিক। ইংরাজদের সে স্বভাবটা খুবই বেশী করিয়া আছে। তাইতে তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া ইহার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন।

ইতিহাস লিখিতে গেলে যে মাল-মসলা পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইতিহাস গড়িয়া লইতে হয়। ইংরাজেরা গোড়ায় যে মাল-মসলা পাইয়াছিলেন, তাহার সমস্তই মুসলমানদের দেওয়া। সুতরাং তাঁহারা ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্ব যখন আরম্ভ হয়, তখন হইতেই ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার আগে হিন্দুরা রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, তাঁহাদেরও ইতিহাস কিছু কিছু ছিল বটে, কিন্তু সে সব সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত তখন ইংরাজেরা কিছু জানিতেন না। সুতরাং মুসলমানেরা যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহারা হিন্দুর ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে পারেন নাই।

মিলের ইতিহাস পড়িলে, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে সত্য, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার ছয় ভলিউমের মধ্যে এক ভলিউম হিন্দুদের ইতিহাস। ইতিহাসের মাল-মসলা ছিল না,—সুতরাং হিন্দুদের সম্বন্ধে কতকগুলি আচার ব্যবহারের কথাই তিনি বলিয়াছেন ; আর হিন্দুদের নিন্দাই করিয়াছেন।

মিলের পর প্রায় ৪০ বৎসর পরে এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন। তখন অনেক সাহেব সংস্কৃত পড়িয়াছেন, কতকগুলি সংস্কৃত পুঁথিও সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু সে সংস্কৃত সকলে পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং এলফিন্‌ষ্টোনকে মুসলমানদের ভারত অধিকারের সময় হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। হিন্দুদের সম্বন্ধে তিনি কেবল সাহিত্যের

---

* ১৩৩৫, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

কথাই কিছু কিছু বলিয়াছেন। রাজবংশ, রাজাদের ইতিহাস কিছুই বলিতে পারেন নাই।

ইহারও ২০ বৎসর পরে মার্শমান্ সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন, হিন্দুদের ইতিহাস সবে ১৬ পাতা, মুসলমানদের প্রায় ২৫০ পাতা, দুই ভলিউমের বাকী প্রায় সব ইংরাজের কথা।

কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে ইউরোপীয়েরা কতকগুলি সংস্কৃত বই পড়িয়াছিলেন। অনেক শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, অনেক সিকা পড়িয়াছিলেন, বিদেশী লোকে ভারতবর্ষের কথা কে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বিদেশীয়দিগের লিখিত ভারতবর্ষের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা উপায়ে ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করিতেছিলেন। কেবল ভাল করিয়া পড়েন নাই সংস্কৃত সাহিত্য—বিশেষ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি। আর যে সব মাল মসলা পণ্ডিতেরা পাইয়াছিলেন, যাঁহারা ইতিহাস লিখিতেন, তাঁহাদের সে সকল প্রায়ই পড়া ছিল না। সুতরাং ইতিহাস সেই পুরাণো ধারায় চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুদের ইতিহাস বলিয়া কতকগুলি পাতা লেখা হইত, তাহাতে রাজারাজড়ার নাম কিছুই লেখা হইত না। রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্প, মনুর সময়ের সামাজিক অবস্থা—এই সব থাকিত। কোন্ বইখানা যে কখন লেখা, তাহার কোন নিরাকরণ ছিল না। সুতরাং যাহা কিছু লেখা হইত, তাহাও একনাগাড়ে হইত না। পড়িলে একটা ধাঁধাঁ লাগা ছাড়া আর কিছুই হইত না। মুসলমানদের ইতিহাস ও ইংরাজদের ইতিহাসের যথেষ্ট মাল-মসলা সংগ্রহ হইয়াছিল। ক্রমেই সেইগুলি ভাল করিয়া লেখা হইতেছিল।

এই দীর্ঘ কালের মধ্যে হিন্দুদের দুইটি ইতিহাসের ঘটনা মাত্র স্পষ্টরূপে জানা গিয়াছিল। একটি বুদ্ধদেবের জন্ম, অপরটি অশোকের শিলালিপি। কোন কোন ঐতিহাসিক সেগুলিও হিন্দু ইতিহাসের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন।

১৮৯৫ সালে আমার ইচ্ছা হইল, বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান-আক্রমণ পর্য্যন্ত এই সময়ের—ষোল সতের শত বৎসরের একটা একনাগাড়ে ইতিহাস লিখি। কিন্তু মাল-মসলা ঐ। আমি তখন ইউরোপীয়দিগের শিষ্য—যে বইএর গ্রন্থকারের পরিচয় না পাইয়াছি, সে বই গ্রহণ করি নাই। সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদি বই আমাকে পরিহার করিতে হইয়াছিল। পরিহার করিয়াও একটা ইতিহাসের আদড়া খাড়া করিতে পারিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক ছিল, সে ফাঁক ভরাইতে পারি নাই। কিন্তু সে সময় ঐ ইতিহাস লইয়াই একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। যাঁহারা ইতিহাস-রসিক ছিলেন, তাঁহারা খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইতিহাস-রসিক ছিলেন না, তাঁহারা একটা তারিখের ভুল, একটা নামের ভুল, একটা ঘটনার ভুল, একটা ছাপার ভুল, একটা বানানের ভুল প্রভৃতি লইয়া কল্লোল কোলাহল তুলিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি যখন তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিয়া চেয়ার হইতে নামিয়া আসেন, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনার এই বক্তৃতায় এমন কিছুই নাই, যাহা আমার বইএ নাই।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "You are a wicked fellow. You have simply anticipated us by some years." সেই বক্তৃতার দরুণ সভাপতি ডাক্তার হারণীর খুব নাম বাজিয়াছিল। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে সংবর্দ্ধনা (Congratulations) পাইয়াছিলেন।

ইহারই কয়েক বৎসর পরে এলাহাবাদ গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেব পেন্সন্ লইয়া দেশে যান এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের কোথায় কি ইতিহাসের খবর বাহির হইতেছে তিনি সেগুলির খুব সন্ধান লইতেন এবং সেগুলি হইতে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই আপনার পুস্তকে ভরিয়া লইতেন। তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহার বইএর চারি এডিশন্ হইয়াছিল। চারি এডিশনেই তিনি অনেক নূতন নূতন কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহার জানা ছিল না; এমন কি সংস্কৃতে যে সমস্ত বই ছাপা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও তিনি পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার ইতিহাসও সেই বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ। ভারতবর্ষের লোকে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের বিশেষ আদর করিয়াছে এবং আরও করা উচিত। এখন কথা হইতেছে, সংস্কৃত-সাহিত্যটাকে এইরূপ তফাতে রাখিয়া কি ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরকালই চলিবে? না আমরা সমস্ত সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িয়া, তাহা হইতে আমাদের ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করিব?

এই সময় আর একটি কথা বলিয়া যাই। এখন একরকম পাণ্ডিত্য হইয়াছে, যাহার মত অসার পদার্থ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। সংস্কৃত কেহই পড়েন না ও পড়িতে পারেন না। যদি ইংরাজীতে তর্জ্জমা হয়, তবে তাহাই পড়িয়া সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ফলান। তর্জ্জমাও ভাল করিয়া পড়েন না। ইন্‌ডেক্স দেখিয়া তাহা হইতে দরকার-মত খবর সংগ্রহ করিয়া লন। ইন্‌ডেক্স হয় কেন?—যে, বইখানা পড়িয়া সব কথা ত আর মনে থাকে না, কোথায় কি আছে, তাও মনে থাকে না, তাই ইন্‌ডেক্স দেখিয়া দরকার-মত জিনিষ বাছিয়া লইতে হয়। যে পড়ে, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ইন্‌ডেক্স হয়। কিন্তু আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা ইন্‌ডেক্স দেখিয়াই বিদ্যা জাহির করেন। আমরা এরূপ পাণ্ডিত্যের কথা বলিতেছি না, যাহারা সত্য সত্য সংস্কৃত পড়ে এবং পড়িতে জানে, তাহাদের কথাই বলিতেছি।

অনেক সংস্কৃত বই ছাপা হইয়াছে। ভালই হউক, মন্দই হউক, ছাপা হইয়াছে। তাই পড়িয়া যাহারা ইতিহাস লিখিতে চাহিবে, তাহাদের কথা বলিতেছি। তাহারা এখন কি করিবে? তাহাদের উচিত, নূতন করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করা।

সে চেষ্টা করিতে গেলে, কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে? এক একবার মনে হয়,

পুরাণ যেমন আরম্ভ করিয়াছে, প্রজাপতিদিগের সময় হইতে ইতিহাস আরম্ভ করা ভাল। ব্রহ্মার মানস পুত্র দশ জন—তাঁহাদের সময় হইতেই আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু এ কালের লোক বলিবে, সে সকল কল্পনামাত্র, সে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। আমার নিজের মত, সেইখান থেকেই আরম্ভ করা ঠিক। সকল দেশেরই ইতিহাসের গোড়ায় খানিকটা কল্পনা থাকে। সেই কল্পনা হইতে ক্রমে ইতিহাসের ক্ষেত্রে লোকে নামে এবং একটি ইতিহাস গড়িয়া ফেলে। তাহার পর ক্রমে সকল কথারই খুঁৎ ধরিতে থাকে। এ খুঁৎ ধরার নাম রিসার্চ্চ। রিসার্চ্চ হইতে পুরাণো ইতিহাসটা পরিষ্কার হইয়া যায়, মিথ্যা ধরা পড়ে, সত্য বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের ঠিক উল্‌টা হইয়াছে। গোড়া হইতে খুঁৎ ধরাই আরম্ভ হইয়াছে—কোথাও কিছু নাই, ফাঁকার উপর খুঁৎ। সুতরাং মালটা এখনও দাঁড়ায় নাই।

কিন্তু আমি এখন আমার মত জাহির করিতে চাই না। লোকে যাহা লইতে চাহে, এমন মতই প্রকাশ করিতে চাই। আমি বলি, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইতে আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হওয়া উচিত।— অনেকে বলিবেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হইয়াছিল কি না, তাহারই ঠিক কি? আমি বলি, তাহা হইলে তোমাদের ইতিহাস পড়ার দরকার নাই। যে ঘটনা হইতে ভারতবর্ষের পুরাণ বল, ইতিহাস বল, গল্প বল, সাহিত্য বল, কাব্য বল, শাস্ত্র বল, সেই ঘটনাকেই যদি তোমরা উড়াইয়া দিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদের ইতিহাসে আর কাজ নাই।

পুরাণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে ধারাবাহিক ইতিহাস ও সময়-তালিকা পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ছয় মাসের মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজা হন। তিনি ৭১ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন ও ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের নাতি পরীক্ষিৎকে রাজা করিয়া যান। পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে নন্দ রাজার রাজত্ব পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, মগধবংশের রাজাদিগের ধারাবাহিক নাম ও রাজত্বের কাল পাওয়া যায়। রাজ্যকালের সমষ্টি ১০৫০ বৎসর। নন্দ রাজার অভিষেক খৃঃ পূঃ ৪২৫ বৎসরে হইয়াছিল। সুতরাং পরীক্ষিতের অভিষেক ১৪৭৫ খৃঃ পূঃ হইয়াছিল। ইহাতে ৩৭ বৎসর যোগ করিলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় (১৫১২ খৃঃ পূঃ) পাওয়া যায়। আমি বলি, এইখানেই আমাদের আরম্ভ করা উচিত।

আমি এখানে কলি যুগের আরম্ভ ও তাহা লইয়া মতামতি, এ সব কথা ধরিতেই চাহি না। চাহি একটি প্র্যাকটিক্যাল্ অব্দ—সেটি ১৫১২ খৃঃ পূঃ। এইখান হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধদেবের জন্ম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল। সুতরাং হিন্দুদের যদি কিছু গৌরবের থাকে, এই সময়েই আছে।

বলিবে, পার্জিটর সাহেব তাঁহার কলি যুগের ইতিহাসে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ১৪৭৫ খৃঃ পূঃ ধরিয়া, তাহার পরে যে আর একখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে ১৪৭৫কে

ক্রমে কমাইয়া কমাইয়া ১০০০এ দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু আমি বলি, তিনি এ কার্য্যটি অন্যায় করিয়াছেন। কেন বলি, তাহার কারণ পরে জানাইতেছি।

কৌটিল্য খৃঃ পূঃ ৩০০ হইতে ৩৫০এর মধ্যে তাঁহার অর্থশাস্ত্র লেখেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার কাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, দণ্ডই রাজার বিদ্যা অর্থাৎ রাজারা দুষ্টের দমন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—না, তাহা হইবে না, শুধু দণ্ড দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না। প্রজাদের ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিতে হইবে অর্থাৎ তাহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে কৃষি-বাণিজ্য ও পশুপালন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। কৃষি, বাণিজ্য ও গো-পালনের নাম এক কথায় বার্ত্তা। মানবেরা বলিলেন, শুধু দণ্ড ও বার্ত্তায় হইবে না, তাহাদের লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। কিন্তু চাণক্যের আচার্য্যেরা বল্লেন—না, তাহাতেও হইবে না, তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। এই যে চারি থাকে অর্থশাস্ত্রের উন্নতি, এ উন্নতি হইতে কত দিন লাগে? ইউরোপে এ উন্নতি হইতে প্রায় বারো শত বৎসর লাগিয়াছিল। রোমান রাজত্বের ধ্বংস (৪৭৬ খৃঃ অঃ) হইয়া গেলে যে অসভ্যেরা ইউরোপ দখল করিল, তাহারা প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা করাই আপনাদের মূল কার্য্য বলিয়া মনে করিল। কৃষিবাণিজ্যাদির তত ভাল ব্যবস্থা বোধ হয় ছিল না। সেই জন্য চারি পাঁচ শত বৎসর পর হইতে ব্যবসায়ীরা আপনাদের ব্যবসায় রক্ষার জন্য জোট বাঁধিতে লাগিল। ক্রমে দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা গেল, সকল দেশে সকল রাজ্যের প্রায় ১৫০টি বণিক্-নগর জোট বাঁধিয়া ব্যবসা চালাইতেছে। ইহাতে রাজাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। তখন রাজারা ঐ জোট ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং আপনারা বাণিজ্যাদির ভার লইতে লাগিলেন। তাহার পর যখন ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ দখল করিয়া লইল এবং সেখানকার গ্রীক পণ্ডিতেরা পশ্চিম ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িলেন, তখন রাজারা তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়া এবং শিক্ষার বিস্তার করা আবশ্যক মনে করিতে লাগিলেন। আর এখন বিংশ শতকে সকল রকম লেখাপড়ার ভারই রাজারা লইয়াছেন। চাণক্য যে চারিটি থাকের কথা বলিয়াছেন, এও ত সেই চারিটি থাক। ইউরোপে যদি এই চারিটি থাক জমিতে চৌদ্দ পনেরো শত বৎসর লাগিয়া থাকে, তবে কৌটিল্যের লিখিত চারিটি থাক জমিতে কত বৎসর লাগা উচিত? আমার বোধ হয়, আরও বেশী বৎসর লাগা উচিত। কারণ, ইউরোপের সমাজ একটা সভ্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর স্থাপিত, আর আমাদের সব গড়িয়া লইতে হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৩৫০ বৎসর চাণক্যের সময় হইতে যদি এই চারি থাকে ১২০০ বৎসরও লাগে, তাহা হইলে ত ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস মোটামুটি খৃঃ পূঃ ১৬০০ বৎসরে পঁহুছিবে।

এ ত গেল রাজনীতির কথা। ধর্ম্মনীতিতে দেখুন। রোম-রাজ্য যখন ধ্বংস হইয়া গেল, তখন ধর্ম্মের কি অবস্থা ছিল? রোম-সাম্রাজ্যের লোক কতক খৃষ্টান

হইয়াছিল, অসভ্যেরা আপনাপন ধর্ম্ম লইয়া থাকিত। শেষ শার্লেমেনের সময় Holy Roman Empire হইলে, রাজা হইলেন শার্লেমেন, পোপ হইলেন ধর্ম্মের কর্ত্তা। ক্রমে সব অসভ্যদেশ খৃষ্টান হইয়া গেল। রোমের প্রভাব খুব বাড়িয়া উঠিল। ভিক্ষুরা প্রবল হইল। তাহার পর এই ভিক্ষুদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য অনেকবার অনেক জায়গায় চেষ্টা হয়। পনেরো শতকে লুথারের চেষ্টা সকলের চেয়ে সফল হইয়াছিল। তারপর এখনকার অবস্থা সকলেই জানেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র ধর্ম্মযাজক হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের একাধিপত্য হইল। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মুক্তিপথের পথিক হইলেন, অনেকে ভিক্ষু হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে আর মানিতেন না। তাই সাত আটটি নূতন ধর্ম্ম হইল। ইহারা কেহই ব্রাহ্মণ মানে না, চেলাও ঢের করে। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায় খুব বড় হইল। ধর্ম্মের এত পরিবর্ত্তন করিতে কত সময় লাগে? ইউরোপে ভিক্ষু মারিয়া পাদ্রী হয়, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ মারিয়া ভিক্ষু হয়, এইমাত্র তফাৎ কিন্তু এ কাজ করিতে কত বৎসর লাগে? পার্জিটরের মত মানিতে হইলে চারি পাঁচ শত বৎসরে এত কাজ করিতে হয়; কিন্তু তা করা যায় না। ইউরোপে যত দিন লাগিয়াছিল, আমাদেরও তত দিন লাগা উচিত, বরং বেশী।

কুরুক্ষেত্রের পর বেদের ব্রাহ্মণভাগ সৃষ্টি হইতে থাকে। কারণ, ব্রাহ্মণ ত শাখাভেদের পর, আর শাখাভেদ জিনিষটা বেদব্যাসের শিষ্যেরা করেন। তখন ব্যাকরণের কি অবস্থা ছিল? অক্ষর ধরিয়া ব্যুৎপত্তি হইত। 'সা' একটা শব্দ, 'ম' একটা শব্দ, দুইটি মিলাইয়া হইল 'সাম'। ছান্দোগ্য উপনিষদের গোড়াটাই দেখুন না, এ রকম অনেক ব্যুৎপত্তি তাহাতে আছে। 'নদী'র 'ঈ'-কার পূর্ব্বরূপ, 'অর্থে'র 'অ'-কার পররূপ, উভয়ে মিলিয়া 'য'-কার একাদেশ হইল। বেদের মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, সংহিতা ও পদপাঠ পড়িতে এই 'য'-কার কোথা হইতে আসিল, এই তর্ক লইয়া সংহিতা-উপনিষৎ হইল। এই সংহিতা-উপনিষৎ অনেক শাখাতেই আছে। এই সকল অতি সামান্য ব্যাকরণের চর্চ্চা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৯০০ ধাতু হইতে সমস্ত শব্দরাশি উৎপন্ন হইয়াছে,—এই মতে উপস্থিত হইতে কত বৎসর লাগে? পাণিনি ত ঐ ১৯০০ ধাতুই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে আর দশ জন ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। দশ থাক ব্যাকরণ লিখিতে কত বৎসর লাগে? পাণিনির সময় ৪০০—৫০০ খৃঃ পূঃ। এই দশ থাক ব্যাকরণ লিখিতে যদি দশ শত বৎসর লাগে, তাহা হইলে ত ১৪০০ বৎসর।

ইউরোপে নাট্যশাস্ত্র কিরূপে আরম্ভ হয়? প্রথম থাকে Mystery play, রোমান্ ক্যাথলিক্ ভিক্ষুরা কথা না কহিয়া প্যান্টোমাইম্ করিত। তাহার পর Miracle play হয়। তার পর থিয়েটার হয়। সে থিয়েটারে সিন্ ছিল কি না, সন্দেহ। কিন্তু এই যে স্তরে স্তরে উন্নতি, ইহাতে ইউরোপে কত বৎসর লাগিয়াছিল? আমাদেরও দেবাসুরের যুদ্ধ লইয়া প্রথম প্যান্টোমাইম্ আরম্ভ হয়। বর্ষা যায়, শরৎ আসে, এমন সময় দেবতারা অসুরদের

জয় করিয়া এক ইন্দ্রধ্বজ খাড়া করিলেন। এখনও ইন্দ্রধ্বজ নেপালে আছে, মহীশূরে আছে। কৃষ্ণ মথুরায় ইন্দ্রধ্বজ তোলা বন্ধ করিয়া দেন, তাইতে তাঁকে গোবর্দ্ধন ধারণ করতে হয়। দেবতারা ইন্দ্রধ্বজের চারি পাশে কেমন করিয়া অসুর বধ করিয়াছিলেন, তাই প্যাণ্টোমাইম্ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। অসুরেরা ব্রহ্মার কাছে গিয়া নালিশবন্দী হইল,—"আমাদের একে ত হারাইয়াছে, তাহার উপব আবার অপমান করিতেছে।" ব্রহ্মা এলেন, বিষ্ণু এলেন, শিব এলেন,—দেবতারাও সমুদ্র-মন্থন দেখালেন, ত্রিপুরদাহ দেখালেন। তাঁরা বলিলেন, "বাঃ! বাঃ! বেশ হয়েছে!" ব্রহ্মা বলিলেন, "এদের বেশ দেওয়া চাই," বিষ্ণু বলিলেন, "এদের প্রহরণ দেওয়া চাই," শিব বলিলেন, "এদেব একটু নাচ দেওয়া চাই।" এই রকমে ক্রমে পাকাপাকি থিয়েটার হয়ে দাঁড়াল। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এ ত নাটকের উৎপত্তি হ'ল,—কত নাটক জন্মাইলে একটা নাট্যসূত্রের দবকাব হয়? পাণিনিরও আগে তিন রকম নাট্যসূত্র অন্ততঃ ছিল। এক ত ভরত মুনির, এক শিলালীব, আব এক কৃশাশ্বের। আর কত ছিল, আমরা জানি না। এই সকল সূত্রের ভাষ্য হইত, টীকা হইত, সংগ্রহ হইত, নিরুক্ত হইত, কারিকা হইত। এই সমস্ত সূত্র, ভাষ্য, নিরুক্ত ইত্যাদি একত্র করিয়া, তবে ত নাট্যশাস্ত্র হইয়াছে। নাট্যসূত্রও ইউরোপে এখনও হয় নাই, নাট্যশাস্ত্রও ইউরোপে এখনও হয় নাই। দেবাসুরের যুদ্ধেব নকল হইতে থাকে থাকে নাট্যশাস্ত্রে উঠিতে কত সময় লাগে? দু' পাঁচ শত বৎসরে হয় না।

তাই বলিতেছিলাম, পার্জিটার সাহেব যে হাজার খৃঃ পূঃ থেকে পাঁচ শত খৃঃ পূর্ব্বের মধ্যে থাকে থাকে এত নব উন্নতি পুরিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইলে কি থলির ভিতর হাতী পুরা হইত না?

আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহাই বলি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতেই আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হওয়া উচিত। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ৩৭ বৎসর, পরীক্ষিতের রাজত্ব ৩৭ বৎসর, জন্মেজয়েরও প্রায় সেইরূপ,—তাঁহার পুত্র শতানীক, তাঁহার পুত্র অশ্বমেধদত্ত, তাঁহার পুত্র অধিসীমকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র নিচক্ষু। পরীক্ষিতের সময় ভাগবত তৈয়ারী হয়, জন্মেজয়ের সময় মহাভারত প্রথম প্রকাশিত হয়, শতানীকের সময় ভবিষ্যপুরাণ লিখিতে আরম্ভ করা হয়, বাকী পুরাণ সমস্তই অধিসীমকৃষ্ণের দোহাই দেয়। পুরাণে এই সকল রাজার কাল বর্ত্তমান কাল বলে। ইহার পূর্ব্বের ঘটনা ভূতকাল বলিয়া লেখা হয় এবং ভবিষ্যতের ঘটনা ভবিষ্যতের বিভক্তি দিয়া লেখা হয়। নিচক্ষুর সময় হস্তিনাপুর গঙ্গাসাৎ হইয়া যায়। পাণ্ডববংশীয়েরা তখন কৌশাম্বীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। এই বংশে সঙ্গীত ও নাট্যসূত্রকর্ত্তা ভরতের জন্ম। এই বংশে সম্রাট্ উদয়নেরও জন্ম,—যিনি হস্তিবিদ্যায় অদ্বিতীয়, বীণাবাদনে অদ্বিতীয়, প্রজাপালনেও অদ্বিতীয়। এই উদয়নই বোধ হয়, বুদ্ধদেবের তুল্যকালিক। এ সকল ইতিহাসের কথা। যাঁহারা বুদ্ধদেবের জন্মকাল হইতে ভারতের ইতিহাস আরম্ভ করেন, তাঁহাদের বলিবার জো নাই। তবে কি এগুলি একেবারেই ইতিহাস নয়?

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শব্দ-সংখ্যা-প্রণালী

পরিচয়

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে সংখ্যা জ্ঞাপনের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অর্ব্বাচীন কালেও তাহার কিছু কিছু ব্যবহার দেখা যায়। উহা সর্ব্বতোভাবে হিন্দুস্থানের নিজস্ব সম্পত্তি। এই প্রণালী-মতে কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করিতে হইলে সরাসরি তাহার নামোল্লেখ না করিয়া, অথবা তন্নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা অঙ্ক ব্যবহার না করিয়া, তদ্‌বিশিষ্ট কোন বস্তুর নামোল্লেখ করিতে হয়। যথা—জগতে একটা বই দুইটা চন্দ্র নাই, তাই এক সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ চন্দ্র উল্লিখিত হয়। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, সুতরাং ব্রহ্ম শব্দও সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। এই প্রকারে ভূ, রূপ প্রভৃতি আরও অনেকানেক শব্দনাম এক সংখ্যা বিবক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়। মানুষের দুইটি কর ও দুইটি নেত্র, তাই দুই সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ কর ও নেত্র এবং তাহাদের পর্য্যায় শব্দ ব্যবহৃত হয়[১]। এই প্রকারে ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যা এবং তদূর্দ্ধ কতিপয় সংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট নামবিশেষের উল্লেখ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। আবার ঐ সকল শব্দের নামের সুনিয়ন্ত্রিত সমাহারবিশেষের দ্বারা ছোট বা বড় অপর যে কোন সংখ্যা সহজে প্রকাশ করা যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন যে, বৃহস্পতি গ্রহ এক মহাযুগে "খদস্রাক্ষিবেদষড়্‌বহ্নি" বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। খ = ০, দস্র = ২, অক্ষি = ২, বেদ = ৪, ষড়্ = ৬, বহ্নি = ৩। এই প্রণালী-মতে সংখ্যানির্দ্দেশক পদগুলি অঙ্কে প্রকাশ করিতে হইলে, যেই ক্রমে পদান্তর্গত এক একটা শব্দনাম লিখিত হয়, নির্দ্দিষ্ট অঙ্কগুলি তদ্‌বিপরীতক্রমে সাজাইতে হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং পাওয়া গেল যে, বৃহস্পতি এক মহাযুগে ৩৬৪২২০ বার ভূপ্রদক্ষিণ করে, এই প্রকার গুণবস = ৮৩, শশিযমশর = ৫২১, সমুদ্রবসুবিষয় = ৫৮৪। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গলে"র রচনার সাল লিখিতে গিয়া বেশ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন,—

> "বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
> এই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা॥"

অর্থাৎ অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে রচিত।

উপযোগিতা

শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশ-প্রণালীর কয়েকটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। প্রথমতঃ উহা ছন্দের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অতি পুরাতন কাল হইতেই হিন্দুরা ছন্দে মনোভাব প্রকাশ

১। অর্ব্বাচীন কালে নেত্র শব্দ কখন কখন তিন সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। মহাদেবের ত্রিনেত্র হইতে ইহার উৎপত্তি। এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা পরে করা যাইবে।

করিতে ভালবাসেন। এমন কি, তাঁহাদের জ্যোতিষ, শিল্প ও গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থগুলিও নানাবিধ ছন্দে লেখা। এক একটা সংখ্যা বা অপব যে কোন ভাব প্রকাশের জন্য বহু শব্দ থাকিলে ছন্দোবন্ধন খুবই সুকর হয়। কারণ, কোন সংখ্যাবাচক শব্দবিশেষেব ব্যবহারে ছন্দ না মিলিলে, তৎসংখ্যানির্দ্দেশক অপর একটি শব্দ ব্যবহাব করিয়া অনায়াসে অভীপ্সিত ছন্দ রক্ষা কবা যায় অথচ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাও প্রকাশিত হয়। শব্দ দ্বাবা সংখ্যা-লিখন-প্রথার উদ্ভাবনাতে সংখ্যাপ্রকাশক শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং তাহাতে ছন্দোবন্ধন ও গ্রন্থরচনা সহজ হইয়াছে বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই প্রণালী-মতে কোন একটা বৃহৎ সংখ্যাকে স্বল্পাক্ষবে প্রকাশ কবা যায়। অধিকন্তু তাহাকে যথাবশ্যক পবিবর্ত্তন করিয়া ছোট বড় কবা যায় ও বিভিন্ন বকমে ব্যক্ত কবিতে পাবা যায়। যে কোন একটা বৃহৎ সংখ্যা লইয়া আলোচনা কবিলেই এই বিশিষ্টতা উপলব্ধ হইবে। ১৪৩৩২৪ একটা বৃহৎ সংখ্যা। সাধারণ নিয়মে ইহাকে প্রকাশ কবিতে গেলে বলিতে হয়, 'এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজাব তিন শত চব্বিশ'। শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী অনুসাবে বলিতে হইবে, 'বেদযুগগুণরামাব্ধিচন্দ্র,' এই পদটি যে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পাক্ষব, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ সংখ্যাটিকে অতি ন্যূন পক্ষে ৩১৪৯১৪৬ বিভিন্ন রকমে প্রকাশ কবা যায়[১]। আবাব আবশ্যকানুযায়ী ইহাকে আরও সংক্ষিপ্ত করা যায়। যথা, সমুদ্রবদহুতাশনমনু, জিনবামগুণমনু, জিনগুরমনু, ইত্যাদি। এই প্রকারে শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়া ছন্দোবন্ধন যেমন সহজ হয়, গ্রন্থ-বাহুল্য-দোষও তেমন কমে। অবশ্য অঙ্কের দ্বারাও কোন সংখ্যাকে স্বল্পপরিসবেব মধ্যে লেখা যায়। কিন্তু অঙ্ক ছন্দের উপযোগী নহে। তৃতীয়তঃ পুরাকালে যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন লোকে হাতে নকল করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ কবিয়া পডিত। অঙ্ক নকল করিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আবার কোন ক্রমে ভুল হইয়া গেলে তাহা ধবা পডিবার সম্ভাবনা কম। ততোধিক কেহ দুরভিসন্ধিবশতঃ কোন সংখ্যা বা তদন্তর্গত কোন একটা অঙ্ক পবিবর্ত্তিত কবিয়া দিলে, অঙ্কের বেলায় তাহা সহজে ধবা পড়িবাব সম্ভাবনা কম, কিন্তু শব্দেব বেলায় ভুল বা চুরি অনায়াসে ধরা পড়িত। কারণ, একের পরিবর্ত্তে অপর শব্দ বা অক্ষর বসাইলে ছন্দের যতি-ভঙ্গ হইয়া যাইত। সুতরাং সংখ্যাব বিশুদ্ধি রক্ষা বিষয়ে শব্দসংখ্যাপ্রণালী অধিকতর উপযোগী। সম্ভবতঃ এই কারণেই পুরাকালের হিন্দুরা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদিতে সংখ্যা-নির্দ্দেশের এই প্রণালীই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, ঐ সকল গ্রন্থে সংখ্যার বিশুদ্ধি রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। অধুনা স্থলবিশেষে তাহা একটা রীতি হইয়া পড়িয়াছে, আর স্থলবিশেষে তাহা যেন পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

১। মহাবীরাচার্য্যকৃত "গণিতসারসংগ্রহে" ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দের উপর নির্ভর করিয়া এই গণনা করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে ১এর জন্য ১১ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ২এর জন্য ১৪ শব্দ, ৩এর জন্য ১৩ শব্দ এবং ৪এর জন্য ১১ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রতি অঙ্কের জন্য পৃথক্ শব্দ প্রয়োগ করিলে সমগ্র সংখ্যাটি ১১×১১×১৩×১৩×১৪×১১ অর্থাৎ ৩, ১৪৯, ১৪৬ ভিন্ন সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। দুই দুইটি অঙ্কের জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করিয়া আরও বহুসংখ্যক পদের সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

উৎপত্তি—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত

শব্দের দ্বারা সংখ্যা-জ্ঞাপন পন্থা যে কখন্ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। জি, আর, কে (G. R Kaye) মনে করেন যে, "খৃষ্টীয় নবম শতকে, সম্ভবতঃ প্রাচ্য হইতে" এই প্রকার সংখ্যালিখনপ্রথা ভারতে প্রবেশ করে।[১] এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনি কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু উহা যে সর্ব্বতোভাবে ভুল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তদুল্লিখিত সময়ের চারি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার গ্রন্থে—বরাহ-মিহির কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ও বৃহৎসংহিতায় তাহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দুরা যে অপর কোন প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য জাতি হইতে উহা গ্রহণ করেন নাই, তাহাও অবিসংবাদিরূপে সত্য। কারণ, অপর কোন জাতির মধ্যে, সংস্কৃত ও অপর কতিপয় ভারতীয় ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষার মধ্যে সংখ্যা নির্দ্দেশের এই প্রকার পন্থার চিহ্ন পাওয়া যায় না। ওয়েবরও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।[২] তিনি বলেন যে, শ্রৌতসূত্রের যুগেই এই প্রকার সংখ্যালিখন-প্রথার প্রথম প্রচলন হয়[৩] ও তাঁহার মতের সমর্থকরূপে তিনি দুইটা প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে[৪] আছে,—"দক্ষিণা গায়ত্রীসম্পন্না ব্রাহ্মণস্য" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দক্ষিণা গায়ত্রী (= ২৪)-সম্পন্ন। সেইরূপ লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রে আছে[৫]—"গায়ত্রী-সম্পন্না দক্ষিণা ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ, জগতীসম্পন্না রাজা"। অর্থাৎ "ব্রাহ্মণকে গায়ত্রী (=২৪)সম্পন্ন দক্ষিণা দিবে, ক্ষত্রিয়কে জগতী (=৪৮)-সম্পন্ন (দক্ষিণা দিবে)"। এই উভয় স্থলেই গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ২৪ সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে। শেষোক্ত বচনে জগতী শব্দের দ্বারা ৪৮ সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে। গায়ত্রী একটা বৈদিক ছন্দের নাম, তাহার তিনটা পাদ; প্রতি পাদে আটটি অক্ষর,[৬] সুতরাং সমগ্র ছন্দে একুনে ২৪টি অক্ষর। জগতীও একটা বৈদিক ছন্দের নাম; তাহার চারি পাদ; প্রতি পাদে ১২ অক্ষর;[৭] সুতরাং সমগ্র ছন্দে একুনে ৪৮ অক্ষর। অপরাপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ওয়েবরকে অনুসরণ করিয়াছেন।

বেদে সংখ্যার দ্বারা শব্দ-নির্দ্দেশ

বেদে দেখা যায় যে, কখন কখন সংখ্যার দ্বারা তৎসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তুকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আছে,[৮]—

১। G. R. Kaye, *Indian Mathematics*, Calcutta, 1925, p. 31.

২। W. Weber, *History of Indian Literature*, English translation by Mannand Zachariæ, London (1878), p. 60.

৩। W. Weber, *Indische Studien*, vol. viii, pp. 166 sq.

৪। ১০।১।৫ ৫। ৯।৪।১৩

৬। পিঙ্গল ছন্দঃসূত্র, ৩।৩

৭। ঐ ৩।৫ ৮। ৭।১০৩।৯

"দেবহিতিং জুগুপুর্দ্বাদশস্য ঋতুং নরো না প্রমিনংত্যেতে"

ভাষ্যকার সায়ন বলেন, "দ্বাদশস্য দ্বাদশমাসাত্মকস্য সংবৎসরস্য", অর্থাৎ এই ঋকে দ্বাদশ সংখ্যার উল্লেখ দ্বারা বৎসরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, দ্বাদশ মাসে এক বৎসর ; সুতরাং "দ্বাদশস্য ঋতুং" অর্থ 'বৎসরের ঋতু'। এইরূপে উদ্ধৃত ঋকের অর্থ হইবে, "নেতা মণ্ডুকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে। ইহারা দ্বাদশ (মাসের) ঋতুগণকে হিংসা করে না"[১]। অথর্ব্ব-বেদে আছে,[২]—"ওঁ যে ত্রিসপ্তা পরিযন্তি" ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ত্রিসপ্ত গমন করে ইত্যাদি। ত্রিসপ্ত পদের ভাষ্যে সায়ন লিখিয়াছেন, "ত্রিসংখ্যাক্রান্তা যে সন্তি তে সর্ব্বে অত্র ত্রিশব্দেন বিবক্ষিতাঃ"। তদ্রূপ "যে সপ্তসংখ্যাক্রান্তাঃ সন্তি তে সর্ব্বে অত্র সপ্তশব্দেন অভি-মতাঃ"। সুতরাং ঐ স্থলে সংখ্যার দ্বারা তৎসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তুই বিবক্ষিত হইয়াছে দেখা যায়। অথর্ব্ববেদের অন্যত্র আছে,[৩]—

"অশীতিভিস্তিসৃভিঃ সামগেভিবাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ"

সায়ন মনে করেন যে, এই স্থলে ত্রি-অশীতি শব্দের দ্বারা গায়ত্রী, উষ্ণিঃ ও বৃহতী তৃচকে অথবা তৎপ্রতিপাদ্য ইন্দ্র দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "তাভিস্তৎসংখ্যাক্রান্তাস্তৃচৈঃ তৎপ্রতি-পাদ্যেন্দ্রদেবতায়া বা"। কারণ, ঐতরেয় আরণ্যকে তাহাদের প্রত্যেকের অশীতিসংখ্যকের উল্লেখ করিয়া তৃচ সংজ্ঞা করা হইয়াছে[৪]। অপর এক স্থলে অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন[৫],—

"নবৈব তা নবতয়ো যা ভূমির্ব্যধূনুত।
প্রজাং হিংসিত্বা ব্রাহ্মণীমসংভব্যং পরাভবন্॥"

এখানে নবনবতি সংখ্যার দ্বারা শম্বরের নবনবতি পুর বিবক্ষিত হইয়া থাকিবে। ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাহাদের ধ্বংসের উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখা যায়।[৬]

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে,[৭]—"একস্মৈ স্বাহা, দ্বাভ্যাং স্বাহা, ত্রিভ্যঃ স্বাহা।" ইত্যাদি। এই প্রকারে এক হইতে উনিশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যা উল্লেখে স্বাহা করিয়া পরে ২৯, ৩৯, ৪৯,...৯৯, ১০০, ২০০ প্রভৃতি সংখ্যাকে স্বাহা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী নয়টি সূক্তেও উক্ত প্রকারে বিভিন্ন সংখ্যাকে স্বাহা করা হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে যে প্রত্যেক সংখ্যার উল্লেখে তৎসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া স্বাহা করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সায়ন বলেন যে, এক সংখ্যার দ্বারা প্রজাপতি বিবক্ষিত

১। রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদ।

২। ১।১।১

৩। ২।১২।৪

৪। ঐতরেয় আরণ্যক, "গায়ত্রী তৃচাশীতিঃ ঔষ্ণিহী তৃচাশীতিঃ বার্হতী তৃচাশীতিঃ।" (১।৪।৩)

৫। ৫।১৯।১১

৬। ১।৫৪।৬

৭। ৭।২।১১

হইয়াছে। কারণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে,—"একস্মৈ স্বাহেত্যাহ, প্রজাপতির্ব্বা একঃ। তমেবাপ্নোতি"। প্রজাপতি এক হইলেও তাঁহার বহু বিভাব। সেই বিভাবগুলি দুই, তিন বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যায়। সুতরাং ঐ সকল সংখ্যার উল্লেখ দ্বারা তত্তৎসংখ্যক বিভাবকে, ততোধিক তদ্‌বিশিষ্ট প্রজাপতিকে প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন,—"অস্য চ সর্ব্বাত্মকত্বাৎ যে যে দ্বিত্বাদিসংখ্যাবিশিষ্টাঃ পদার্থাস্তে সর্ব্বেঽপি প্রজাপতিরূপাঃ।"

কি প্রকারে যে শব্দ ও সংখ্যার মধ্যে এই নিগূঢ় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল, তৈত্তিরীয় সংহিতার কয়েকটি সূক্তে[১] তাহা সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তথায় ছয় সংখ্যাকে ঋতুর সঙ্গে, ১৫, ১৭, ২১, ৩৩, ২৪, ৪৪, ৪৮ প্রভৃতি সংখ্যাকে তত্তৎসংখ্যক স্তোমের সঙ্গে, আবার তাহার কোন কোনটাকে তদক্ষরবিশিষ্ট বৈদিক ছন্দের সঙ্গে নিগূঢ়রূপে সম্পর্কিত করা হইয়াছে। তাহারা সমতুল্য। সায়ন বলেন,—"ষট্‌সংখ্যাদ্বারেণর্ত্তু প্রাপ্তিঃ। তদ্দ্বারা সংবৎসরপ্রাপ্তিঃ," "চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাদ্বারা গায়ত্রীপ্রাপ্তিঃ, তদ্দ্বারা চ ব্রহ্মবর্চ্চসপ্রাপ্তিঃ।" ইত্যাদি। এইরূপ ৪৪ = ত্রিষ্টুভঃ, ৪৮ = জগতী ইত্যাদি।

শব্দের দ্বারা সংখ্যা-জ্ঞাপন—ভগ্নাংশ

বেদে কখন কখন শব্দ দ্বারা সংখ্যাও নির্দ্দেশিত হইত। বিশেষভাবে ভগ্নাংশগুলিই এই উপায়ে বেশী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখা যায়। এক চতুর্থাংশ বুঝাইতে তখন পাদ শব্দ উল্লিখিত হইত। এখনও হইয়া থাকে। এই সংজ্ঞার উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয় যে, গরুর চারিটি পা। চারিটার একটাকে একপাদ বা শুধু পাদ বলিতে হয়। এইরূপে পাদ শব্দ $\frac{1}{4}$ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল[২]। সংস্কৃত শ্লোকের চারি ভাগের এক ভাগকেও পাদ বা চরণ বলা হয়। ছন্দঃ-প্রিয় বৈদিক ঋষি এই কারণেও এক চতুর্থাংশ অর্থে পাদ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। এই প্রকার শফ = $\frac{1}{8}$, কুষ্ঠ = $\frac{1}{12}$, কলা = $\frac{1}{16}$। শফ অর্থ ক্ষুর। গরুর আটটি ক্ষুর, তাই ক্রমে অষ্টাংশ বুঝাইতে শফ শব্দ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কুষ্ঠ শব্দের উৎপত্তি জানা নাই। কলা শব্দের ব্যবহার চন্দ্র হইতে। চন্দ্রের ষোল কলা বা অংশ, প্রতি তিথিতে তাহার এক একটা ক্ষয় বৃদ্ধি হয়; সুতরাং এক কলা ষোল ভাগের এক ভাগ[৩]। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,

---

১। ৭।২।১৫—৬। এই প্রকারের দৃষ্টান্ত তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিরল নহে।

২। পরবর্ত্তী কালে পাদ = অঙ্‌ঘ্রি = ৪, এই ব্যবহার ও পাওয়া যায়।

৩। অর্ব্বাচীন কালে কলা শব্দ কখন কখন ১৬ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ও ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। মনোহর দাস প্রণীত "অনুরাগবল্লী"র সমাপ্তি-সন লিখিত আছে,—

'বসুচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্রসিতেঽমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যাস্তুপূর্ণানুরাগবল্লিকা॥"

বসু = ৮, চন্দ্র = ১, কলা = ১৬; অর্থাৎ ১৬১৮ শকে।

"ষোড়শকলঃ পুরুষঃ"[১]। তদ্রূপ আপস্তম্বশুল্বসূত্রে আছে,[২]—"তৃতীয়েন নবমী কলা"। এই উভয় স্থলেই "কলা" শব্দ "অংশ" বা "ভগ্নাংশ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রকৃত উৎপত্তি বেদে

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংখ্যার দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ এবং বস্তুর নামের দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশ, এই উভয় প্রথা সামান্যবিশেষ ভাবে বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল। উভয়ে প্রকৃত পক্ষে এক পর্য্যায় ভুক্ত। সংখ্যা ও তদ্বিশিষ্ট বস্তুর নাম, এই উভয়ের অন্তর্নিহিত সম্পর্কটাকে মুখ্যরূপে মানিয়া লইলে একের গ্রহণে অপরের গ্রহণ স্বতঃই হয়। গুণ ও গুণীর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য ও নিত্য। হিন্দুর দর্শনে এই তত্ত্বটি চিরকাল স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বিশেষণের উল্লেখে তদ্বিশিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া বাক্য প্রয়োগ করার প্রথা এ দেশে অতি প্রাচীন ও সাধারণ। ইহার জন্য দার্শনিক পরিভাষাও সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, শব্দসংখ্যালিখনপ্রণালীর প্রকৃত উৎপত্তি বেদে। ইহার মধ্যে এই মাত্র বিশেষ আছে যে, সংখ্যার দ্বারা শব্দ নির্দ্দেশের দৃষ্টান্ত বেদে যত পাওয়া যায়, শব্দের দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশের দৃষ্টান্ত (ভগ্নাংশ ব্যতীত) তত পাওয়া যায় না। যাহা হউক, পরে পরে প্রথমোক্ত প্রথা পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু অপর প্রথার প্রচলন রহিয়া গেল। অধিকন্তু নব নব শব্দ-সম্পদের প্রয়োগে, নব নব তত্ত্বের অবতারণায় কালক্রমে তাহা সঞ্জীবিত ও অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। আমরা এখন তাহারই আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতসূত্র

শব্দের দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশের প্রথা বেদের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতসূত্রাদিতেও সামান্য-বিশেষভাবে চলিয়া আসিয়াছে। কাত্যায়ন ও লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা গিয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ[৩] এবং শতপথ ব্রাহ্মণে[৪] 'কৃত' (= ৪) শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৫] 'বিরাট' ও 'পঙ্‌ক্তি' শব্দ কয়েক স্থলেই সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিরাট (= ১০) শব্দের ব্যবহার বৌধায়নের শুল্বসূত্রেও পাওয়া যায়[৬]। সংখ্যার প্রতি স্বাহাকারী যেই সূক্তটি ইতিপূর্ব্বে তৈত্তিরীয়সংহিতা হইতে আহৃত হইয়াছে, তাহা—

১। ৬।৭।১

২। ৪র্থ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক

৩। "যে বৈ চত্বারঃ স্তোমা কৃতং তৎ," তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।৫।১১।১)

৪। "চতুষ্টোমেন কৃতেন অয়ানাং," শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩।৩।২।১)

৫। ২।২৪ ; ৩।২৩ ; ৪।১৬, ১৮ ; ৫।৪, ৬, ১৯ ; ৬।২৯

৬। ১।৭৮

সামান্যবিশেষ পরিবর্ত্তিতরূপে মৈত্রায়ণী সংহিতা[১], কৌষীতকী সংহিতা[২], শতপথ ব্রাহ্মণ[৩], আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র,[৪] কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র[৫] ও বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে[৬] পুনরুক্ত হইয়াছে। আরও বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এই একটা দৃষ্টান্ত ব্যতীত সংখ্যার দ্বারা শব্দ নির্দ্দেশের অপর কোন দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থাদিতে বিরল। অপরন্তু শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশ প্রথার প্রচলন ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

অনিশ্চয়তা-দোষ

এই প্রকারে সংখ্যা নির্দ্দেশের একটা দোষ আছে। দার্শনিকের পরিভাষায় এই ব্যবহারটা হইল লক্ষণাপ্রয়োগ। সুতরাং লক্ষণাপ্রয়োগের যাহা দোষ, তাহা ইহাতে থাকিবার কথা। গুণ ও গুণীর সম্পর্ক কতকটা নিত্য হইলেও একই গুণ বহু বস্তুতে থাকিতে পারে। আবার একই বস্তুর বহু গুণও থাকিতে পারে। সুতরাং লক্ষ্যার্থ ধরিয়া শব্দ প্রয়োগ করিতে গেলে কথঞ্চিৎ অনিশ্চয়তা-দোষ থাকিয়া যায়। ঐ সকল স্থলে স্থান, কাল ও ঔচিত্য বিচার করিয়া এক কথায় বক্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া বাক্যের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একই 'বিরাট' শব্দ কখন ১০ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থে[৭], কখন বা ৩০ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থে[৮] ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। বস্তুতঃ বিরাট একটা ছন্দের নাম; তাহার তিন পাদ; প্রতি পাদে সাধারণতঃ ১০ অক্ষর; সুতরাং একুনে বিরাট ছন্দে ৩০ অক্ষর। সমষ্টি পাদস্থ অক্ষরের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বিরাট শব্দ ৩০ সংখ্যার বাচক। আর ব্যষ্টি পাদস্থ অক্ষরের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিরাট ১০ সংখ্যার বাচক।[৯] আর একটি বৈদিক ছন্দের নাম পঙ্‌ক্তি; তাহার পাঁচ পাদ; প্রতি পাদে ৮ অক্ষর; সুতরাং একুনে ৪০ অক্ষর[১০]। পাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈদিক সাহিত্যে ৫ সংখ্যা বিবক্ষার্থে পঙ্‌ক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে[১১]। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে দশাক্ষরা ছন্দকে পঙ্‌ক্তি বলা হইত। সুতরাং তখন পঙ্‌ক্তি শব্দ হইল ১০

১। ৩।১২।১৫

২। ২।১—১০ (অশ্বমেধ)

৩। ১২।২।১।৫,৬

৪। ২০।১০।৭ ৫। ২০।৪।৩২ ৬। ১৫।২১

৭। ৩।২৩; ৪।১৮; ৫।১৯ ৮। ৪।১৬

৯। বিরাটের অক্ষর সংখ্যা সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মতভেদ দেখা যায়। কোথাও দেখা যায়—বিরাট দশাক্ষরা (৬।২০); কোথাও বিরাট ত্রিংশদক্ষরা (৪।১৬); আর কোথাও বা ৩৩ অক্ষরা (২।৩৭)। প্রকৃতপক্ষে বিরাটের পাদ সম্বন্ধে কোন মতভেদ দেখা যায় না। প্রতি পাদস্থ অক্ষর সংখ্যা সম্বন্ধেই ভেদ—এক একটি পাদ নবাক্ষরা, দশাক্ষরা বা একাদশাক্ষরাও হইতে পারে। তবে দশাক্ষরা প্রয়োগই অধিক।

১০। পিঙ্গল ছন্দঃসূত্র (৩।৩৭-৪৮) দেখ।

১১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২।২৪, ৪।৪, ৬; ৬।২৯

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, "অথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ" (৮।১।১০), "পঞ্চ কৃত্ব আঙ্‌ক্তে পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ" (৬।১।১)। বৃহদ্দেবতা ১৮৬

সংখ্যার বাচক[১]। শব্দরত্নাবলী ও পদ্মপুরাণে অযোধ্যার রাজা দশরথকে 'পঙ্‌ক্তিরথ' বলা হইয়াছে[২]।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ হইতে ত্রিসপ্তের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে উহার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা বলা হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে ঐ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলাও যায় না। ত্রিসপ্তের ব্যাখ্যায় সায়ন বিচক্ষণ বুদ্ধি ও বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়া যাইতেছি। সায়ন বলেন যে, 'ত্রিসপ্ত' এই সমাসবদ্ধ পদকে তিন রকমে বিশ্লেষণ করা যায়। (১) "ত্রয়ো বা সপ্ত বা", (২) "ত্রিঃ সপ্ত", অর্থাৎ তিনটা সপ্ত, এবং (৩) "ত্রিগুণিতা সপ্তসংখ্যা" অর্থাৎ একবিংশতি। প্রথম অর্থে ত্রি বুঝাইবে পৃথিব্যাদি ত্রিলোক, তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নি, বায়ু আদিত্য, ত্রিগুণ; অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সপ্ত বুঝাইবে, সপ্ত ঋষি, সপ্ত গ্রহ, সপ্ত মরুদ্গণ, সপ্ত লোক, অথবা সপ্ত ছন্দ। দ্বিতীয় অর্থে ত্রিসপ্ত বুঝাইবে সপ্ত দিশ, সপ্ত ঋত্বিজ ও সপ্ত আদিত্য;[৩] অথবা সপ্ত সিন্ধু, সপ্ত লোক ও সপ্ত দিক্[৪], অথবা সপ্ত গ্রহ, সপ্ত ঋষি ও সপ্ত মরুদ্গণ। তৃতীয় অর্থে ত্রিসপ্ত—দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, ত্রিলোক ও আদিত্য, এই একবিংশতি বস্তুকে বুঝাইতে পারে, অথবা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও এক অন্তঃকরণ, এই একবিংশতি। সায়ন আরও বলেন যে, এই প্রকার সংখ্যাবিশিষ্ট যে যে দেবতা আছেন, ত্রিসপ্ত শব্দে তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে। "এবং উক্তলক্ষণাস্ত্রিসপ্তসংখ্যা যে দেবাঃ পরিযন্তি।" অনিশ্চয়তাদোষযুক্ত আরও কতিপয় সংখ্যাবাচক শব্দের আলোচনা পরে করা যাইবে।

পরবর্ত্তী যুগ—জ্যোতিষ, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র

ইতিপূর্ব্বে উক্ত শাস্ত্র ব্যতীত অপরাপর কোন কোন শাস্ত্রেও শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশ পন্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে বেদাঙ্গজ্যোতিষের কথা। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতকে লেখা। তাহাতে আপ (=৪), অয় (=৪), যুগ (=১২), রূপ (=১), গণ (=ভগণ=২৭), ভসমূহ (=২৭), এবং তিথি (=১৫) শব্দের সংখ্যার্থ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৫] বরাহমিহির, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ পরবর্ত্তী কালের হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্গণের

১। মেদিনীকোষ দ্রষ্টব্য। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে আছে, "যস্য দশ তা পঙ্‌ক্তিঃ (৯.২), "চত্বারিংশদক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ" (১৭।৩)

২। "অযোধ্যায়াং মহারাজঃ পুরা পঙ্‌ক্তিরথো বলী।
তস্যাত্মজো রামচন্দ্রঃ সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ।"—পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড।

৩। ঋগ্বেদ (৯।১১৪।৩) দ্রষ্টব্য।

৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২।৮।৩।৮) দ্রষ্টব্য।

৫। বেদাঙ্গজ্যোতিষ বিষয়ে পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় গণিতজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় "যাজুষ জ্যোতিষ" ও "আর্চ জ্যোতিষ" নাম দিয়া দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশ প্রথা দেখা যায়। যাজুষ জ্যোতিষ—১৩, ২০, ২৩, ২৫ ও আর্চ জ্যোতিষ—৮, ১৯, ৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থে বিশেষভাবে এই প্রণালীতে সংখ্যা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রেও (খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে) এই প্রকারের দুই চারিটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়[১]। যথা—অক্ষ (=৫), নক্ষত্রমালা (=২৭), পাদ (=$\frac{1}{4}$) ও সপাদ (=১$\frac{1}{4}$)। পিঙ্গল প্রণীত ছন্দঃসূত্রে এই প্রয়োগের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ছন্দঃসূত্রে শব্দসংখ্যালিখন প্রথাই বিশেষ ভাবে অনুসৃত হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থে এত প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে ভগ্নাংশ ব্যতীত, সংখ্যানির্দ্দেশক পাঁচ ছয়টির বেশী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। বেদাঙ্গজ্যোতিষে সর্ব্বসমেত ৭টি শব্দের উল্লেখ আছে। আর পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রের ন্যায় স্বল্পকলেবর গ্রন্থে প্রায় ২০টি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়[২]। তাই মনে হয় যে, ঐ সময়ে এই প্রকারের সংখ্যানির্দ্দেশ-প্রণালী শাস্ত্রকারগণের প্রিয় হইয়া থাকিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্র খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বে লেখা[৩]। মহাভারতেও শব্দসংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়[৪]।

স্থানীয়-মানের অবতারণা—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক

শব্দের দ্বারা সংখ্যাজ্ঞাপনকারী যে সকল গ্রন্থের নাম এই পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিতে সংখ্যাজ্ঞাপক শব্দ স্থানীয়-মান সহকারে ব্যবহৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয়-মানের অবতারণার পূর্ব্বে সংখ্যানির্দ্দেশের এই প্রথাটিকে বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও একটা সংখ্যাজ্ঞাপক পূর্ণাঙ্গ প্রণালী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, তদ্ব্যতীত ছোট বা বৃহৎ যে কোন সংখ্যাকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। কখন হইতে যে শব্দগুলি সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ স্থানীয়-মান সহকারে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, সেই বিষয় এই পর্য্যন্ত প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে[৫]। স্মিথ ও কার্পিনিস্কি মনে করেন যে,"স্থানীয়-মান সহ শব্দের ব্যবহার অন্তত পক্ষে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে আরম্ভ হয়।"[৬] বরাহমিহিরের (৫০৫ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থ দৃষ্টান্তে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তদপেক্ষাও আগেকার প্রমাণ দুর্ল্লভ নহে। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা উপস্থিত করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভট্টোৎপল (৯৬৬ খৃষ্টাব্দ) বৃহৎসংহিতার স্বপ্রণীত টীকায় "মূল পুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন[৭],—

১। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ডাক্তার শ্যামশাস্ত্রী প্রকাশিত।

২। ছন্দঃসূত্রে ৫৩ স্থলে শব্দসংখ্যার প্রয়োগ আছে।

৩। Macdonell—*History of Sanskrit Literature*, 1904, ch. ix.

৪। মহাভারত, বনপর্ব্ব, শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত।

৫। অতঃপর যখনই শব্দ-সংখ্যা-প্রণালীর উল্লেখ হইবে, তখন স্থানীয় মান সহ শব্দের ব্যবহার বুঝিতে হইবে।

৬। D. E. Smith and L. C. Karpinski, *The Hindu-Arabic Numerals*, Boston, 1911, p. 38.

৭। বৃহৎসংহিতা, ভট্টোৎপলকৃত টীকা সহিত, সুধাকর দ্বিবেদী সংস্করণ, কাশী, ২৭ পৃষ্ঠা।

"খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশররাত্রয়ঃ।
ভানাং চতুর্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ইহাতে শব্দসংখ্যা-লিখনপ্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। পুলিশসিদ্ধান্ত অতি পুরাতন জ্যোতিষগ্রন্থ। কত পুরাতন, বলা যায় না। তাহার রচনাকাল বস্তুতঃ অজ্ঞাত। বরাহের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় যে পাঁচখানি সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন আছে, পুলিশ-কৃত সিদ্ধান্ত তাহার অন্যতম। সুতরাং পুলিশ যে বরাহের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নিশ্চিত। বরাহ বলেন যে, পুলিশসিদ্ধান্তের লাটকৃত এক সংস্করণ ছিল[১]। সুতরাং মূল সিদ্ধান্ত তাহারও বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে। পরে পরে ঐ সিদ্ধান্তের আরও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়[২]। স্বয়ং ভট্টোৎপল ঐ প্রকারের দুইখানি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটাকে তিনি বলিয়াছেন "পুলিশসিদ্ধান্ত", অপরটির নাম দিয়াছেন "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত"। থিবো[৩] মনে করেন যে, মূলপুলিশসিদ্ধান্ত ৪০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং বলিতে হয় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকেও সংখ্যানির্দ্দেশক নাম স্থানীয় মান সহকারে ব্যবহৃত হইত।

শিলালেখ ও তাম্রলেখ

৮৯৮ বিক্রম-সংবতের (=৮৪২।৩ খৃষ্টাব্দ) এক শিলালেখে শব্দসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার দেখা যায়[৪]। ভারতবর্ষের বাহিরে কম্বোজ-রাজ্যের রাজধানী বায়াং নগরীতে প্রাপ্ত ৬০৪ ও ৬২৫ খৃষ্টাব্দের দুইখানি শিলালেখে উহা ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ আছে[৫]। তখনকার দিনের কম্বোজ-রাজ্যে হিন্দুসভ্যতা প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ উহা ছিল হিন্দু উপনিবেশ। ঐ প্রকারের সংখ্যা-লিখন-প্রণালী ভারতবর্ষ হইতেই তথায় গিয়াছিল। শিলালেখ দুইটির ভাষা সংস্কৃত। মূলে আছে—"রসাশ্বিবাণ" (৫২৬) ও "ঋতুসমুদ্রেন্দ্রিয় (৫৪৬) শককাল। এই দুইটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার পরের অনেক শিলালেখে শব্দসংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়[৬]। অপর হিন্দু উপনিবেশ যবরাজ্য ও চম্পারাজ্যে প্রাপ্ত বহু শিলালেখে উহার ব্যবহার আছে[৭]।

১। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোক।

২। পুনঃ পুনঃ সংস্করণে মূল গ্রন্থ বহুল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে ঐ নামের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না—মূল ও সংস্করণ, সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৩। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, থিবো এবং থিবেরিকৃত সংস্করণ, ভূমিকা, ৬০ পৃষ্ঠা।

৪। *Indian Antiquary*, vol. XIV, p. 45; compare also vol. vii, p. 16.

৫। Barth, *Inscriptions Sanscrites de Campa et du Cambodge*, 1885, pp. 34-6; quoted by Dr. Bijanraj Chatterji, *Indian Cultural Influence in Cambodia*, 1928, pp. 47-8.

৬। *Indian Antiquary*, vol. vxi, pp. 47 sq.

৭। R. C. Mazumdar—*Ancient Indian Colonies in the Far East*, vol. I—Champa, Lahore, 1927. Vide Inscriptions Nos. 16, 20-24, 26, 30-32, 35, 37-47, 52-55, 60, 62, 79, 84, 94, 121.

প্রাকৃত ভাষায় শব্দসংখ্যার অভাব

যদিও অতি প্রাচীন কাল হইতেই সংস্কৃত-সাহিত্যে শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশের প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তথাপি পালি ও অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতি সমসাময়িক অপর ভারতীয় সাহিত্যে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। পালি বৌদ্ধধর্ম্মের ভাষা[১]; আর অর্দ্ধমাগধী ছিল জৈন ধর্ম্মের ভাষা। খৃষ্টীয় অব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ঐ দুই ভাষার চর্চ্চা ভারতবর্ষে প্রবল ছিল। তাহাদের সম্পদ্‌ও কম নহে। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত সংখ্যা নির্দ্দেশের এমন সুন্দর ও উপযোগী প্রণালীটি কেন যে ঐ দুই সাহিত্যে অনুসৃত হইত না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়[২]। ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে সকল শব্দ সংখ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, তাহার কোনটাতে বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। বৌদ্ধশাস্ত্র বা বৌদ্ধদর্শন ইত্যাদি হইতে নির্ব্বাচিত কোন শব্দ এই পর্য্যন্ত পাই নাই। জৈন প্রভাবও অতি যৎসামান্য জিন (=২৪) ও সিদ্ধ (=২৪) শব্দ দুটি বরাহমিহিরের কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। তদ্ব্যতীত অপর কোন শব্দে জৈনপ্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। খৃষ্টীয় নবম শতকে জৈন গণিতজ্ঞ মহাবীরাচার্য্য, সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র হইতে কতিপয় শব্দ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে সেগুলি স্বীকৃত হয় নাই দেখা যায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, ভারতের বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাবের যুগের পূর্ব্বে, সংস্কৃতভাষী কোন বৈদিক হিন্দু পণ্ডিত শব্দ-সংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। পূর্ব্বপ্রচলিত বৈদিক প্রথা হইতে তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট সঙ্কেত পান বটে, কিন্তু নব নব শব্দ-সম্পদ্ আহরণ করিয়া, তাহাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তোলার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁহারই। প্রথম প্রথম উহা অতি অল্পসংখ্যক (—তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যাদি ও অনুগত—) লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, অপর সাধারণে তাহা বুঝিত না। কোন সাঙ্কেতিক ভাষার গুপ্ত সংখ্যা-নির্দ্দেশ-পন্থারূপে হয় ত বা ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বহু কাল এইরূপে ব্যবহৃত হওয়ার পর,

---

১। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার লুডার্স সেদিন কলম্বো নগরীর এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পালি আদিতে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশের ভাষা ছিল। মগধের ভাষা ছিল অর্দ্ধমাগধী। ভগবান্ বুদ্ধ ঐ ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনগ্রন্থাদি প্রথমে অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। পরে কারণবশতঃ তাহা পালিতে ভাষান্তরিত করা হয়। এই বিষয়ে তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা নাকি বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। এই মতবাদ প্রকৃত হইলে পালিতে শব্দ-সংখ্যার ব্যবহার না থাকা আশ্চর্য্য নহে।

২। বৃহদ্‌গচ্ছের গুর্ব্বাবলীতে নিম্নলিখিত দু'টি গাথা দেখিতে পাওয়া যায়,—

সুন্নমুনিবেয়জুত্তা (৪৭০)

জিনকলা বিক্কমো ববিসসট্টী (৬০)।

ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় দশম শতকে রচিত। কিন্তু এই প্রকার প্রমাণও অতীব বিরল। *Indian Antiquary*, vol. xi, p. 252.

পিঙ্গলের সময়ে তাহা ধীরে ধীরে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। এই প্রকারের মতবাদ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনুমানের উপরই বেশী নির্ভর করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাকে একেবারে অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। কারণ, বিশদ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া শব্দ-সংখ্যা-প্রণালী প্রায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। অধিকন্তু তাহার মধ্যে পৌরাণিক অপেক্ষা বৈদিক প্রভাবই বেশী বিদ্যমান।

সংখ্যার্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রাচীনতা

বর্ত্তমান সময়ে বিদিত যেই সকল গ্রন্থে শব্দসংখ্যার বহুল প্রচলন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বরাহমিহির প্রণীত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎসংহিতা ও বৃহজ্জাতক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুপরিচিত। ব্যবহৃত শব্দের উপপত্তি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কথঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বৃহজ্জাতকে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত[১]। অপর দুই গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ বেদ, সংহিতা ও দর্শনাদি শাস্ত্র হইতে নির্ব্বাচিত। ফলিত জ্যোতিষ-সম্পর্কিত কোন শব্দের প্রয়োগ এগুলিতে নাই। সুতরাং শব্দ নির্ব্বাচনের হিসাবে ইহাদিগকে ভিন্ন প্রণালী বলা যাইতে পারে। কোন প্রণালীতে একই শব্দ দুই সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু দুই একটি শব্দ বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন সংখ্যার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—অর্থ। জাতকের মতে লগ্ন হইতে দ্বিতীয় ঘরে অর্থ বিচার করিতে হয়, তাই বৃহজ্জাতকে অর্থ শব্দ দ্বি সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় অর্থ = ৫। মানুষের ইন্দ্রিয় পাঁচটা; সুতরাং তাহার বিষয় বা অর্থও পাঁচটা। কিন্তু উভয় প্রণালী মতেই বিষয় = ৫। সেই প্রকার জাতক ভিন্ন শাস্ত্র হইতে নির্ব্বাচিত অপর শব্দও উভয় প্রণালীতে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—রস = ৬, রুদ্র = ১১, মনু = ১৪, কৃত = ৪ ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী লেখকেরা পঞ্চসিদ্ধান্তিকার প্রণালী স্বীকার করিয়াছেন। ফলিত-জ্যোতিষের প্রণালীর ব্যবহার দেখা যায় না[২]। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যদিও পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা বরাহের ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন পর্য্যায় শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন, নব নব তত্ত্বের বিচার দ্বারা বা অপর যুক্তিযুক্ত উপায়ে নূতন শব্দসংখ্যার উদ্ভাবনায় কোন চেষ্টা করেন নাই। জৈন মহাবীর সামান্য কয়েকটি নূতন শব্দ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপর কর্ত্তৃক যে সেগুলি স্বীকৃত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। সুতরাং মূল বিষয়ই এক রকম পরিবর্ত্তন-হীন অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। বরাহের পূর্ব্ববর্ত্তী পুলিশসিদ্ধান্তে ও সূর্য্যসিদ্ধান্তেও বরাহের ব্যবহৃত শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়[৩]। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, পুলিশেরও বহু

১। বৃহজ্জাতকে স্থানীয়-মানের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

২। অতি আধুনিক সময়ে দুই এক স্থানে দেখা যায়। যথা—রন্ধ্র = ৮। ফলিতজ্যোতিষ মতে লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান রন্ধ্র।

৩। ভট্টোৎপলধৃত মূল পুলিশসিদ্ধান্তের বচনে আছে, রাত্রি = ১। অপর কুত্রাপি এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না।

পূর্ব্ব সময় হইতে শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রণালীর প্রথম উদ্ভাবনা তাহারও বহু পূর্ব্বের হইবে।

পৌরাণিক প্রভাবের ক্ষীণতা

এই প্রকার মনে করিবার আরও বিশেষ কারণ এই যে, সংখ্যার্থে ব্যবহৃত শব্দগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক প্রভাব কম। কতকগুলির ব্যবহার ত পৌরাণিক শিক্ষার বিপরীত। পুরাণে প্রায় সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ হয়। অগ্নিপুরাণে অর্ণব শব্দ ৭ অঙ্ক নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক কালেও প্রায় সর্ব্বত্রই সেই প্রয়োগ। অপর পক্ষে পিঙ্গল হইতে ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই সমুদ্রকে ৪ অঙ্ক নির্দ্দেশার্থ ব্যবহার করিয়াছেন। কবিকল্পলতার মতে সমুদ্র ৪ বা ৭ যে কোন সংখ্যাকে বুঝাইতে পারে। বেদে এক স্থলে[১] সপ্ত সিন্ধুর উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ চতুঃসমুদ্রের উল্লেখই বেশী হয়। বৈদিক সাহিত্যাদিতেও তাই। কবিকল্পলতায় বহু পৌরাণিক শব্দ দেখা যায়। যথা—পাণ্ডব (=৫), পুরাণ (=১৮), বিদ্যা (=১৪,১৮), গণেশদন্ত (=১),শুক্রচক্ষু (=১),ত্রিশিরানেত্র (=৬), হরবাহু (=৬)। এই প্রকারের আরও বহু শব্দ আছে। পৌরাণিক শিক্ষা বহু কাল পূর্ব্ব হইতে ভারতের মজ্জাগত হইয়া আছে। হিন্দু ভারতবাসীর সমস্ত চিন্তা ও ভাবপ্রবাহ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তৎপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আছে। অথচ শব্দসংখ্যায় তাহার প্রভাব অতি ক্ষীণ। এটা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, পৌরাণিক শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পূর্ব্বে শব্দসংখ্যা প্রণালী সুগঠিত হইয়া গিয়াছিল। আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থাদিতে বৈদিক ছন্দের নামগুলিই বেশীর ভাগ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইতে। পরবর্ত্তী কালে তাহারা এক প্রকার পরিত্যক্ত হয়। কৃতি, ধৃতি প্রভৃতি কয়েকটি ছন্দনাম পরবর্ত্তী কালে সংখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু বেদসাহিত্যে তাহাদের ব্যবহার নাই। তাহার দুইটা কারণ হইতে পারে—প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি যে, ছন্দনামগুলি অনিশ্চয়তা-দোষযুক্ত। বিভিন্ন উপপত্তি ধরিয়া তাহাদের নাম-বিশেষকে বিভিন্ন সংখ্যার্থে ব্যবহৃত হইত। এই দোষ পরিহারের জন্য পরবর্ত্তী কালের উদ্ভাবয়িতা তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। কৃত প্রভৃতি শব্দে অনিশ্চয়তা-দোষ আদবেই ছিল না। তাই তাহারা পরিত্যক্ত হয় নাই। কৃতি, ধৃতি প্রভৃতি নূতন আমদানী। তাই এগুলি সেই দোষযুক্ত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ সাঙ্কেতিক ও গুপ্তি অর্থে ব্যবহারের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে পূর্ব্বপরিচিত শব্দ পরিত্যক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।৮।৩।৮

খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতক ও মহাভারত

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাভারতেও শব্দ-সংখ্যার প্রয়োগ আছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শব্দবিশেষের দ্বারা তাহাতে পরবর্ত্তী কাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংখ্যা নির্দ্দেশিত হইত। যথা—১ সংখ্যা বিবক্ষার্থ মহাভারতে অগ্নি, সূর্য্য, দেবরাজ বা যম শব্দ ব্যবহার আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অগ্নি = ৩, সূর্য্য = ১২, দেবরাজ (= ইন্দ্র) = ১৪, এবং যম = ২। আদিত্য শব্দের উল্লেখ পিঙ্গলছন্দঃসূত্রেও পাওয়া যায়। তথায় আদিত্য ১২ সংখ্যাকে নির্দ্দেশ করে। এই অসাধারণ প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, মহাভারতের যুগে শব্দ-সংখ্যা প্রথাটা বর্ত্তমান আকারে প্রণালীবদ্ধ হয় নাই। কতকগুলি আভ্যন্তরিক জ্যোতিষিক প্রমাণের সাহায্যে শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত অনুমান করেন যে মহাভারত খৃষ্টের প্রায় ৪৫০ বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত। ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া জেকোবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও ঐ কাল নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকেও শব্দসংখ্যা-প্রণালীর সৃষ্টি হয় নাই।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে—পাটলীপুত্রে

কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে "সমবৃত্তা" নামে এক তুলাদণ্ডের উল্লেখ আছে। তাহার লৌহদণ্ডের উপর মানপরিজ্ঞাপক চিহ্ন খোদিত থাকিত। সর্ব্বপ্রথম চিহ্ন কর্ষ মানের। অপরাপর চিহ্ন সম্বন্ধে কৌটিল্য বলেন[১],—

"ততঃ কর্ষোত্তরং পলং, পলোত্তরং দশ পলং, দ্বাদশ পঞ্চদশ বিংশতিবিতি কারয়েৎ। ততঃ আশতাদ্দশোত্তরং কারয়েৎ। অক্ষেষু নান্দীপিনদ্ধং কারয়েৎ।"

"তারপর এক এক কর্ষ বৃদ্ধি করিয়া পল (পর্য্যন্ত), পল পল বৃদ্ধি করিয়া দশ পল (পর্য্যন্ত), দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও বিংশতি এই চিহ্ন করিবে। অতঃপর দশ বৃদ্ধি করিয়া শত পর্য্যন্ত চিহ্নিত করিবে। অক্ষস্থলাদিতে নান্দীচিহ্ন খোদিত করিবে"[২]। অক্ষেষু বহুবচনান্ত পদ। সুতরাং তদ্দ্বারা যে বহু সংখ্যাস্থলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সংখ্যা কোন্-গুলি? প্রাচীন টীকাকার ভট্টস্বামী মনে করেন যে, পাঁচ ও সমস্ত পঞ্চগুণা সংখ্যা "অক্ষেষু" পদে বিবক্ষিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীও এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "অক্ষেষু" দ্বারা পঞ্চম, দশম, পঞ্চদশাদি সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে।

১। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, শ্রীশ্যাম শাস্ত্রী সম্পাদিত ও ইংরাজি ভাষান্তরিত, ২য় অধিকরণ, ১৯ অধ্যায়।

২। উক্ত স্থলের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শ্যাম শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর মধ্যে সামান্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে কোন ব্যাখ্যায় আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে বাধা হয় না। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, স্বকৃত টীকাসহ মহামহোপাধ্যায় গণপতি-শাস্ত্রীর সংস্করণ, ত্রিবিন্দ্রম, ১৯২৪।

"অক্ষেষু পঞ্চমদশমপঞ্চদশাদিষু"। ইঁহাদের কাহারও ব্যাখ্যা ঠিক নহে। কারণ, ৫, ১০, ১৫, ২০, ৩০ ..ইত্যাদি পলমানজ্ঞাপক স্থলে যখন ঐ ঐ সংখ্যাচিহ্ন খোদিত করিবার কথা বলা হইয়াছে, তখন ঐ সকল স্থলে পুনরায় নান্দীচিহ্ন খোদিত করা নিষ্প্রয়োজন[১]। সুতরাং ২৫, ৩৫, ৪৫... ইত্যাদি পলমানজ্ঞাপক স্থলই যে নান্দীচিহ্নিত করিবার কথা কৌটিল্য বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেও এই বিষয় সম্যক্-রূপে বোধগম্য হইবে। আধুনিক তুলামানদণ্ডেও ১, ৫, ১০, ২০ ইত্যাদি বা অপর প্রধান প্রধান সংখ্যাগুলি খোদিত থাকে। মধ্যবর্ত্তী সংখ্যার মান স্থলে অপর কোন না কোন চিহ্ন দেওয়া থাকে। স্থানসংকীর্ণতাবশতঃ পর পর সকল সংখ্যা লেখা যাইতে পারে না বলিয়াই উক্ত নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই অনুমান প্রকৃত বলিয়া মনে হইলেও আমাদের দেখাইতে হইবে যে, কি করিয়া একমাত্র অক্ষ শব্দের দ্বারা এতগুলি সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নতুবা এই অনুমানকে নিছক কল্পনা বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না। সুতরাং বক্তার ব্যবহৃত ভাষা হইতে দেখাইতে হইবে যে, তাঁহার অভিপ্রায় ও আমাদের অনুমানে প্রভেদ নাই। অক্ষ শব্দ পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থাদিতে পঞ্চ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। উক্ত স্থলেও যে তদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোন মতভেদ নাই। শব্দ-সংখ্যা প্রণালী অনুসারে লিখিত ২৫, ৩৫, ৪৫,...ইত্যাদি প্রত্যেক সংখ্যাবাচক পদ অক্ষযুক্ত হইতে পারে। যথা,—২৫ = অক্ষকর, ৩৫ = অক্ষাগ্নি, ৪৫ = অক্ষবেদ, ৫৫ = অক্ষবাণ, ইত্যাদি। সুতরাং অক্ষ শব্দের দ্বারা যখন তাহাদের সকলকে লক্ষণা করা যাইতে পারে, তখন "অক্ষেষু" বাক্যের অর্থ হইবে "অক্ষপূর্ব্বসংখ্যাদিষু।" এতদ্ব্যতীত অপর কোন প্রকারের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত স্থলের সম্যক্ অর্থসঙ্গতি হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমান সত্য। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত স্থলে অক্ষ শব্দ স্থানীয় মান সহকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই হেতু স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য স্থানীয়-মানতত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ তৎসহ শব্দ প্রয়োগ করিতেন।

শব্দসংখ্যা, সাধারণ অঙ্ক ও শূন্য চিহ্ন

বুলার ও বার্ণেল[২] প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, শব্দসংখ্যা-প্রণালী সাধারণ অঙ্ক-প্রণালীর পরে উদ্ভাবিত। কৌটিল্য যখন স্থানীয় মানতত্ত্ব জানিতেন, তখন তাঁহার সময়ে আমাদের সাধারণ অঙ্কপ্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শূন্য চিহ্ন (০) স্থানীয়-মানতত্ত্বের

১। ডাক্তার শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয় এই কঠিন বিষয়ের সমাধানের কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার অনুবাদ "In the place of Akshas, the sign of Nandi shall be marked." তাঁহার পাদটীকায় ভট্টস্বামীর উল্লেখ আছে।

২। Bühler, *Indische Palæographie*, English translation by Fleet; A. C. Burnell, *South Indian Palæography*; J. F. Fleet, *Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. III.*

প্রাণ। শূন্য চিহ্ন ব্যতীত স্থানীয়-মান নির্দ্দেশ করা যায় না[১]। অপর পক্ষে স্থানীয়-মানতত্ত্ব ব্যতীত শূন্য চিহ্ন পরিকল্পনা করা নিরর্থক। বস্তুতঃ তাহারা উভয়ে সহজাত। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বে হিন্দুরা শূন্য চিহ্ন জানিতেন। খুব সম্ভব যে, অথর্ব্ববেদেও তাহার উল্লেখ আছে[২]। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে, কৌটিল্যের সময়ে শূন্য চিহ্ন ও স্থানীয়-মানতত্ত্ব পরিজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নহে। কৌটিল্য যে তুলাদণ্ডে পরিমাণজ্ঞাপক চিহ্ন করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহা অঙ্কে লিখিত হইত। শ্যাম শাস্ত্রী ও গণপতি শাস্ত্রী উভয়েই এই বিষয়ে একমত। কৌটিল্য বলেন যে, দণ্ডে "বিংশতি পঞ্চাশৎশতমিতি পদানি কারয়েৎ"। অন্যত্র তিনি দণ্ডটাকে "পদবতী" বলিয়াছেন। গণপতি শাস্ত্রী বলেন, পদ অর্থ (অঙ্ক) রেখা। পদবতী—"একদ্বিত্র্যাদিরেখোপেতা"। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিকাশের অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার কথা আছে। সমগ্র রাজ্যটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া, তাহার প্রত্যেকটি হইতে দৈনিক, সাপ্তাহিক (বা পঞ্চাহিক), পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক রাজস্ব আদায়-বিবরণী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বিভাগ করিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইত এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, তাহা পুস্তকনিবদ্ধ হইত। হিসাব পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী (সংখ্যায়ক) নিযুক্ত থাকিত[৩]। সংখ্যা জ্ঞাপনের কোন সরল প্রণালী ব্যতীত অত পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রতি গ্রামের বিস্তৃতভাবে আদমসুমারী রাখার কথা আছে। গ্রামস্থ ভিন্ন ভিন্ন জমিকে বিভিন্ন "সংখ্যা"-চিহ্নিত করিবার কথা আছে। গ্রামের করদ ও অকরদ গৃহে পৃথক্ সংখ্যা বসিত। "গৃহাণাং চ করদাকরদসঙ্খ্যানেন..."[৪]। এই প্রকার স্পষ্ট কথনের পর কৌটিল্যের সময়ে ভারতবর্ষে যে সংখ্যালিখনপ্রণালী ছিল, তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তবে সেই প্রণালীটা যে কি রকম, এখন আমরা তাহা সঠিক বলিতে পারি না।

সংখ্যা-নাম ও শব্দসংখ্যার সংমিশ্রণ

কখন কখন সংখ্যার নামও এই প্রণালীতে লিখিত হইত দেখা যায়। শ্রীধরাচার্য্যের (৭৫০ খৃষ্টাব্দ) "ত্রিশতিকায়" এই প্রকারের দৃষ্টান্ত আছে। যথা,—"ষট্‌পঞ্চদ্বিকরাশেঃ (২৫৬)

১। আবেকস (abacus) বা অন্য কোন প্রকার সংখ্যাজ্ঞাপক যন্ত্র ভারতবর্ষে কখনও ছিল বলিয়া প্রমাণ নাই।

২। Bibhutibhusan Datta, "Early Literary Evidence of the Use of the Zero in India," *American Mathematical Monthly*, vol. 33, 1926, pp. 449—54. Compare also "Early History of the Arithmetic of Zero and Infinity," *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. 18, 1927.

৩। অর্থশাস্ত্র, ২য় অধিকরণ, ৭ম অধ্যায়।

৪। ঐ, ২য় অধিকরণ, ৩৫শ অধ্যায়।

স্থিথস্থিরাশেন্চ (২০৩)"[১]। মহাবীরের "গণিতসারসংগ্রহে"ও তাহা বিরল নহে[২]। যথা—"একাষ্টচতুঃসপ্তকনবষট্পঞ্চাষ্টক"=৮৫৬৯৭৪৮১। "একাদিষডন্তানি ক্রমেণ হীনানি" =১২৩৪৫৬৫৪৩২১। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "পঞ্চত্র্যক"=১৩৫ ও "দিত্রিপাণি"= ৩২ হাত। আবার কখনও বা সংখ্যানাম ও শব্দসংখ্যা উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। যথা,—"কৃতবসুনবাষ্টনবনবষট্ত্রিনবাগেন্দবো"[৩] =১৭৯৩৬৯৯৮৯৮৪। "সপ্তশূন্যং দ্বয়ং দ্বয়ং পঞ্চৈকঞ্চ প্রতিষ্ঠিতম্"[৪] =১৫২২০৭। এই প্রকারে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যবোধে আমরা তাহাতে বিরত রহিলাম। সকল গ্রন্থকারই সুবিধানুযায়ী সংখ্যা নাম ও শব্দসংখ্যার সংমিশ্রণ অনুবিস্তর করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী প্রণীত "বৈষ্ণব-তোষণী" ও স্বপ্রণীত "লঘুতোষণী" রচনার সময় সম্বন্ধে জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"শকে ষট্সপ্ততিমনৌ (১৪৭৬) পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈক (১৫০৪) গণিতে তথা॥"

বামাগতি ও দক্ষিণাগতি

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে লিখিত সংখ্যানির্দ্দেশক পদগুলি অঙ্কে প্রকাশ করিতে বিপরীত রীতি অনুসরণ করিতে হয়। আর্য্য জাতিরা বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগতিক্রমে লিখিয়া থাকেন। সুতরাং সংখ্যাবাচক পদগুলিও দক্ষিণাগতিতে লিখিত হইত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহাদিগকে অঙ্কে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করিবার সময় পদান্তর্গত প্রত্যেক শব্দের বিবক্ষিত সংখ্যা দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর বাম দিকে, অর্থাৎ বামাগতিতে সাজাইতে হয়, ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম যে কেন অবলম্বিত হইল, এই পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তোষ-জনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে ইহার মধ্যে যে কোন বামাগতি-লিপিক জাতির প্রভাব নাই, তাহা সুনিশ্চিত। কারণ, সেই প্রকার কোন জাতির মধ্যে শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

কখন কখন এই প্রণালীতে দক্ষিণাগতিও অনুসৃত হইত বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কাশীরাম দাসের বিরাট পর্ব্বের একখানি সুপ্রাচীন পুঁথি হইতে দুই পঙ্ক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন[৫]।

"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥"

১। ত্রিশতিকা, সুধাকর দ্বিবেদী সংস্করণ, কাশী, ১৮৯৯, পৃষ্ঠা ৪,৬। (রূপ=১) ব্যতীত অপরাপর শব্দসংখ্যার প্রয়োগ শ্রীধর করেন নাই।

২। গণিতসারসংগ্রহ, পরিকর্ম্মব্যবহার, ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, সুধাকর দ্বিবেদী সংস্করণ, কাশী, ১৯০২, মধ্যমাধিকার, ১৭ শ্লোক।

৪। গণিতসারসংগ্রহ, ১০ পৃষ্ঠা। এই প্রকারের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, ৯—১২ পৃষ্ঠা।

৫। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯ সন, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

দক্ষিণাগতি ধরিলে উদ্দিষ্ট সময় হইবে ১৫২৬ শক, আর বামাগতি ধরিলে হইবে ৬২৫১ শক। বর্ত্তমানে ১৮৪৯ শকবর্ষ চলিতেছে। সুতরাং ৬২৫১ পাঠ ভুল, ১৫২৬ পাঠই শুদ্ধ। এইরূপে দেখা যায়, কাশীরাম দাস ১৫২৬ শকে বিরাটপর্ব্ব রচনা সমাপ্ত করেন। কাশীরাম দাসের জীবনকালের সঙ্গে তাহার কোন অসঙ্গতি হয় না[১]। সুতরাং উক্ত বচনে সংখ্যা-নির্দ্দেশ করিতে দক্ষিণাগতি অনুসৃত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। মাণিক গাঙ্গুলির "ধর্ম্মমঙ্গল" রচনার সময় সম্বন্ধে লেখা আছে[২] :—

"শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিন্ধু সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥"

এখানে অঙ্ক দক্ষিণাগতি ক্রমে লিখিতে হইবে বলিয়া স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইরূপ প্রথম পঙ্‌ক্তি হইতে পাওয়া যায় ৬৪৭ সংখ্যা। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে, 'সিন্ধু' পাঠ ভুল, তাহা 'সিদ্ধি' হইবে। সিদ্ধি—৮, যুগ=২ (?), পক্ষ—২। দক্ষিণাগতি ক্রমে উদ্দিষ্ট সংখ্যা হয় ৮২২। উভয়ের যোগফল ৬৪৭+৮২২ অর্থাৎ ১৪৬৯ শকবর্ষে ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হয় বলিয়া দীনেশবাবুর মত[৩]। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন যে, 'সিন্ধু' পাঠ শুদ্ধ; সিন্ধু—২৪, যুগ—৪, পক্ষ—২। তিনি আরও মনে করেন যে, উক্ত কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে দক্ষিণাগতি অবলম্বিত হইলেও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে গ্রন্থকার বামাগতি অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং উদ্দিষ্ট সংখ্যা ২৪২৪। উভয়ের যোগফল ৬৪৭+২৪২৪ =৩০৭১। পুনরায় বামাবর্ত্তন করিয়া পাওয়া গেল ১৭০৩। ঐ শকবর্ষে মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া যোগেশবাবুর মত[৪]। এই ব্যাখ্যায় বিচক্ষণতার পরিচয় থাকিলেও তাহা সরল ও সহজ নয়; বড় কট্‌মট্‌। উহাতে যেন কিঞ্চিৎ অধিক কল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। তাই নিঃসংশয়ে তাহা স্বীকার করা যায় না। ইহার অনুকূলে যোগেশবাবু বলেন যে, মাণিকরামের বংশলতা তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রাপ্ত সময়ের সমর্থন করে। কিন্তু শ্রীযুক্ত

১। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি কাশীরাম দাসের ভাই গদাধর দাসের হাতের লেখা ১৫৫৪ শকের একখানি মহাভারতের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন। Vide Dinesh Chadra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta, 1911, p. 219.

২। কবির বংশধরের নিকট প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে নাকি আছে,—

"সাকে রীও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সির্দ্ধসহ জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥"

এই পাঠ যে ভুল; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ভিন্ন রকমের। আমরা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩ সন; ১০-১২ পৃষ্ঠা।

৪। ঐ, ১৩১৫ সন, ৫৩ পৃষ্ঠা। প্রবাসী, ২৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৩ সন, ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা; ২৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৩৩৪ সন, ৬৪০ পৃষ্ঠা।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহাতে সন্দেহ করিয়াছেন[১]। যাহা হউক, উভয় গতির ঐ প্রকার অদ্ভুত সংমিশ্রণের অপর কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। দীনেশবাবুর ব্যাখ্যায়ও কিছু দোষ আছে। যুগ শব্দ সর্ব্বত্র ৪ অঙ্ক নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হয়, ২ অর্থে ব্যবহারের কোণ প্রমাণ নাই। অধিকন্তু তাহার উপপত্তিও হয় না। তিনি যে সিদ্ধি পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারও কোন সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করেন নাই। বস্তুতঃ তাহার আবশ্যকতাও নাই। সাধারণতঃ জৈন তীর্থঙ্কর হইতেই সিদ্ধ (=২৪) শব্দের উপপত্তি ধরা হয়। পাতঞ্জলযোগে সিদ্ধ অর্থে তাহার উপপত্তি ধরিলে সিদ্ধ শব্দ ৮ অঙ্ককে বুঝাইবে। কারণ, যোগদর্শনের মতে সিদ্ধি ৮ প্রকার[২]। উক্ত কবিতার উভয় পঙ্‌ক্তিতে একই রীতি অনুসৃত হইয়াছে মনে করা অধিক সঙ্গত। সুতরাং ৬৪৭+৮৪২ অর্থাৎ ১৪৮৯ শকে মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিবে[৩]।

কোন একটা বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ করিতে গিয়া মহাবীরাচার্য্য এক স্থলে লিখিয়াছেন[৪]—"ষট্‌ত্রিকং পঞ্চষট্‌কঞ্চ সপ্ত চাদৌ প্রতিষ্ঠিতম্।" অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য বলেন যে, অত্রোদ্দিষ্ট-সংখ্যা ৩৩৩৩৩৬৬৬৬৬৭। সর্ব্ব দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া এই পাঠ স্বীকার করা যাইতে পারে না। (১) প্রথমতঃ এই পাঠোদ্ধারে দক্ষিণাগতি অনুসৃত হইয়াছে; ঐ প্রকারের অপর কোন দৃষ্টান্ত মহাবীরের গ্রন্থে নাই। (২) দ্বিতীয়তঃ সাধারণতঃ ষট্‌ত্রিক ৬×৩ অর্থাৎ ১৮ কে বুঝায়; তদ্রূপ পঞ্চষট্‌ক=৫×৬=৩০। সুতরাং উদ্দিষ্ট সংখ্যা বস্তুত পক্ষে ৭৩০১৮ হইবে। ৭৬৬৬৬৬৩৩৩৩৩ যে হইতে পারে না, তাহাও নহে। সে যাহা হউক, আমরা ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলাম যে, শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে সময় সময় দক্ষিণাগতিও অবলম্বিত হইতে পারে বলিয়া রঙ্গাচার্য্য মহাশয় মনে করেন।

হিন্দী কবি যোধরাজ, তাঁহার "হাম্মির রসো"র রচনাকাল দিয়াছেন,—

চন্দ্র নাগ বসু পঞ্চ গিনি সংবৎ মাধব মাস। (১৭৮৫)
শুক্র সুলিত্তিয়া জীবজুত তাদিন গ্রন্থপ্রকাশ ॥

তিনি দক্ষিণাগতিক্রমে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। বামাগতি ধরিলে গ্রন্থরচনার কাল হয় ৫৮৭১ সংবৎ; উহা অসম্ভব[৫]।

১। প্রবাসী, ২৭ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৪, ২৫২ পৃষ্ঠা।

২। ঐ যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে, এমন কি, ধর্ম্মমঙ্গলেও সিদ্ধ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উহা নিশ্চয় যোগসিদ্ধির সম্পর্কে ব্যবহৃত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণও অণিমাদিসিদ্ধ পুরুষকে সিদ্ধ বলিয়াছেন। (শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ড, ৭৮ অধ্যায়)। তথায়, এমন কি, ৩২ সিদ্ধের প্রসঙ্গও আছে।

৩। জোগ=যোগ পাঠ ঠিক আছে বলা যায়। যোগের আট অঙ্গ, সুতরাং যোগ=৮। এই প্রকারে ধর্ম্মমঙ্গল রচনার সময় হইবে ৬৪৭+৮৮২ অর্থাৎ ১৫২৯ শক।

৪। গণিতসারসংগ্রহ, পরিকর্ম্মব্যবহার, ১১শ শ্লোক, ১০ পৃষ্ঠা।

৫। এই কবিতাটির জন্য আমি কাশীর শ্রীযুক্ত ত্রিভুবননারায়ণ সিংহের নিকট ঋণী। তিনি হিন্দী সাহিত্য হইতে শব্দসংখ্যাবিষয়ক আরও অনেক খবর সংগ্রহ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী কবি চাঁদবর্দ্দাই স্থানীয়মান যুক্ত শব্দসংখ্যা ব্যবহার করেন নাই।

কতিপয় দুরূহ শব্দের উপপত্তি বিচার

শব্দসংখ্যা-প্রণালীতে এমন কতিপয় শব্দের সচরাচর প্রয়োগ দেখা যায়, যাহাদের উপপত্তি দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাবৃত। তাহাদের উপপত্তি সন্ধান করিতে গেলে যে শুধু ঐ প্রণালীর উদ্ভাবনার কাল পাওয়া যাইবে, তাহা নহে; ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার কোন কোন লুপ্ত তত্ত্বও ব্যক্ত হইয়া পড়িবে মনে হয়। আমরা এ স্থলে সেই প্রকারের দুএকটি শব্দের পরিচয় দিতেছি। কিন্তু তাহাদের ও অপরাপরগুলির বিশদ ও পূর্ণ আলোচনা বিজ্ঞতর ব্যক্তির শক্তি-সাপেক্ষ। প্রথমে 'অক্ষ' শব্দকে গ্রহণ করা যাক্। কৌটিল্য হইতে ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে ৫ অঙ্ক জ্ঞাপনার্থ উহার প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রয়োগের উপপত্তি কি? অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলা বৈদিক যুগে এ দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আর পৌরাণিক যুগে এই দ্যূতখেলার মোহে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে আপনার রাজ্য, দেশ, এমন কি, স্ত্রীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ভীষণ ধ্বংসলীলার বিষময় ফলভোগ করিতেছে। যাক্, বৈদিক যুগে সাধারণতঃ চার পাশা নিয়া খেলা হইত। তাহাদের নাম ছিল কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি[১]। কৃত ছিল জিতিবার পাশা ও কলি ছিল হারিবার পাশা[২]। ইহাদের উপর যথাক্রমে ৪, ৩, ২ ও ১এর অঙ্ক খোদিত বা লিখিত থাকিত[৩]। কখন কখন কলির উপর পাঁচের অঙ্ক থাকিত।[৪] অথবা পাঁচ পাশার দ্বারা খেলা হইত। কাশিকাকার "পঞ্চিকা" নামক পাঁচ পাশার খেলার উল্লেখ করিয়াছেন। তখন কলি হইত জিতিবার পাশা[৫]। এই কারণেই বোধ হয়, কলির অপর নাম ছিল "অভিভূ" বা "অক্ষরাজ"[৬]। কেহ কেহ মনে করেন যে, পাশাখেলায় অঙ্কের খেলও ছিল[৭]। আজকাল

১। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৪।৩।৩, বাজসনেয় সংহিতা, ৩০।১৮, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৫।

২। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকেও 'কৃত' (প্রাকৃত "কড") জিতিবার পাশা ছিল। তাহাকে কখন কখন "কর্ত্তা"ও বলা হইত। (মৃচ্ছকটিক, ২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ শ্লোক) উভয়ের মূল এক। এই খবর আমি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাইয়াছি। অক্ষক্রীড়াবিষয়ক অপরাপর সন্ধান শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ওঝা কৃত "প্রাচীন লিপিমালা" হইতে গৃহীত।

৩। সেণ্ট পিটর্সবর্গ অভিধান দেখ। ঋগ্বেদে (১০।৩৪।২) আছে;—

অক্ষস্যাহমেকপরস্য হেতোরনুব্রতামপজায়ামরোধম্।"

একপর অর্থ—যাহার উপর একের চিহ্ন আছে। কারণ, পাণিনি বলেন, "অক্ষশলাকাসংখ্যাঃ পরিনাঃ" (২।১।১০)

সুপ্রসিদ্ধ আরবী পর্য্যটক আলবিরুণী এক প্রকার ভারতীয় পাশা খেলার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে এক জোড়া পাশা নিয়া খেলা হইত। তাহাদের উপর অঙ্ক খোদিত থাকিত।

৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, "অথ যে পঞ্চ কলিঃ সঃ।" (১।৫।১১।১)

৫। বাজসনেয় সংহিতা, ১০।২৮

৬। শতপথ ব্রাহ্মণ, ৫।৫।৪।৬; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।৪।১।১৬; বাজসনেয় সংহিতা, ৩০।১৮। মহাভারতের যুগেও এই নাম প্রচলিত ছিল। মহাভারত, কুম্ভকোণম্ সংস্করণ, বিরাট পর্ব্ব, ৫০।৩৭।

৭। Macdonell and Keith, *Vedic Index.*

তিন পাশা নিয়া খেলা হয়। যাহা হউক, এইরূপে আমরা সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত 'কৃত' (=৪)[১] ও 'অক্ষ' (=৫) শব্দের উপপত্তি পাই। অক্ষক্রীড়ার বিবর্ত্তনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে শব্দসংখ্যা-প্রণালীর উৎপত্তির আভাসও পাওয়া যাইতে পারে।

'অঙ্ক' শব্দের উপপত্তি বিচার হিন্দু গণিতের ইতিহাস চর্চ্চার বিশেষ উপযোগী। তাহাতে অনেক সংশয়ের সহজ সমাধান মিলে। বরাহমিহির হইতে পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থকার ৯ সংখ্যার পরিবর্ত্তে 'অঙ্ক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রচলিত দশমিক হিন্দু সংখ্যালিখন-প্রণালীতে সর্ব্বসমেত দশটা চিহ্ন বা 'অঙ্ক' আছে। সংস্কৃত ভাষায় অঙ্ক ও চিহ্ন সমানার্থক : সুতরাং সংশয় হয় যে, অঙ্ক শব্দ দশ সংখ্যা জ্ঞাপন না করিয়া নয় সংখ্যা জ্ঞাপন করে কেন। তবে কি মনে করিতে হইবে যে, যে সময়ে শব্দসংখ্যা-প্রণালীতে অঙ্ক শব্দের আবির্ভাব হয়, তখন সর্ব্বসমেত নয়টি 'অঙ্ক' হিন্দুরা জানিতেন? কেহ কেহ এই প্রকারই বলেন। তাঁহারা মনে করেন যে, আদিকালে হিন্দুরা শূন্য-চিহ্ন পরিকল্পনা করেন নাই। ওটা অনেক পরের সৃষ্টি। শূন্যচিহ্ন ব্যতীত সংখ্যালিখন-প্রণালী এ দেশে ছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে নয়টার অপেক্ষা অনেক বেশী—কত বেশী, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে না,—অঙ্কের বা চিহ্নের আবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল সংখ্যালিখন-প্রণালীতে ছিলও তাহাই। সুতরাং সেই দিক্ দিয়া অঙ্ক শব্দের উপপত্তি হইয়া থাকিলে, তাহা অনিশ্চিত রকমের বেশী সংখ্যার জ্ঞাপক হওয়া উচিত ছিল। ততোধিক স্থানীয়মান-তত্ত্বহীন, শুধু যৌগিক নিয়মানুসারী কোন শব্দসংখ্যা-প্রণালীর অস্তিত্বের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বার্ণেল ও বুলার প্রমুখ মনীষিগণ মনে করেন যে, শব্দসংখ্যা-প্রণালী সাধারণ সংখ্যালিখন-প্রণালীর পরে উদ্ভাবিত। তাঁহাদের মত যদি সত্য হয়, সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, তবে শব্দসংখ্যা-প্রণালী উদ্ভাবনার সময়ে এ দেশে শূন্যচিহ্ন লইয়া সর্ব্বসমেত দশটি চিহ্ন ছিল। তথাপি অঙ্ক শব্দ নয় সংখ্যা জ্ঞাপন করে কেন? এই প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক—তাহাই প্রকৃত—উত্তর এই যে, হিন্দুগণ শূন্যচিহ্নকে একটা অঙ্ক বলিয়া মনে করেন না। শূন্যচিহ্ন একাকী কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করে না। অপরাপর চিহ্নগুলি একাকী, স্বগুণে সংখ্যা জ্ঞাপন করিতে পারে। কিন্তু শূন্য কোন অঙ্কের সহযোগে আসিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সংখ্যাজ্ঞাপন-শক্তিটাকে বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে। এইরূপে

১। ছান্দোগ্যোপনিষদের শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রকরণে দশ সংখ্যাকে 'কৃত' বলা হইয়াছে। যে হেতু 'বিরাট' শব্দও দশ সংখ্যা জ্ঞাপন করে, সেই হেতু বলা হইয়াছে যে, 'কৃত' ও 'বিরাট' সমান—

"তে বা এতে পঞ্চান্তে পঞ্চান্তে দশ সন্তস্তৎ কৃতং তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু অন্নমেব দশকৃতং সৈষা বিরাড়ন্নাদী . ।" (৪।৩।৮) ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য "শারীরকভাষ্যে" (১।১।২৫) ইহার উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "সংখ্যা-সামান্য" কারণে এক শব্দ "অর্থান্তর" নির্দ্দেশের জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দশ সংখ্যার 'কৃত' নামকরণ করার কারণ নাকি 'কৃত' নামক পাশার উপর এক কালে দশাঙ্ক লিখিত থাকিত। যাহা হউক, শব্দসংখ্যা-প্রণালীতে দশ সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ 'কৃত' শব্দের ব্যবহারের কোন প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

শূন্যের শক্তি মুখ্য না হইয়া গৌণ। কিন্তু তাহা যে অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে শূন্য স্থানবিশেষে চিহ্ন বা অঙ্কের অভাব নির্দ্দেশ করে। তাই মধ্যযুগের হিন্দু গণিতবিশারদগণ শূন্যকে সংখ্যামধ্যে পরিগণিত করিলেও অভাব বলিয়া তাহার সংজ্ঞা করিয়াছেন[১]। অপর নয়টি ভাব চিহ্ন। তাহাদের সংখ্যাজ্ঞাপন-শক্তি মুখ্য ও স্বনিষ্ঠ এবং তাহাদিগকেই সাধারণতঃ অঙ্ক বলা হয়। তাই অঙ্ক নয়টি। সেই কারণে অঙ্ক শব্দ নয় সংখ্যা জ্ঞাপন করে। সুতরাং দেখা গেল যে, অঙ্ক শব্দ নয় সংখ্যা জ্ঞাপন করে বলিয়াই তৎকালে শূন্য চিহ্ন ছিল না, মনে করা ভুল। এই প্রকারে আমরা আর একটি দুরূহ প্রশ্নের সুন্দর সমাধান পাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে সিরিয়াবাসী ধর্ম্মযাজক সেবোখ্ত সেবোক্ত প্রসঙ্গক্রমে হিন্দুর নবাঙ্কের উল্লেখ করিয়াছিলেন[২]। তদ্দৃষ্টে কোন কোন মনীষী অনুমান করেন যে, যে সময়ে হিন্দু গণনা-প্রণালী সিরিয়া দেশে প্রবেশ করে, তখন তাহাতে শূন্য চিহ্ন ছিল না। এবং ঐ কারণেই তাঁহারা মনে করেন যে, শূন্যচিহ্নের পরিকল্পনা ও স্থানীয়মানতত্ত্বের আবিষ্কার খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের বেশী কাল পূর্ব্বে হয় নাই। একমাত্র উপরিলিখিত আলোচনা হইতেই বোধগম্য হইবে যে, তাঁহাদের অনুমান কত ভিত্তিহীন। নবাঙ্কের উল্লেখ দেখিয়া শূন্য চিহ্ন ছিল না বলা যাইতে পারে না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের বহু পূর্ব্বে যে এ দেশে শূন্য চিহ্ন ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা অন্যত্র দিয়াছি এবং ইতিপূর্ব্বে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি। মেক্সিমস প্লেনুদস (১৩০০ খৃষ্টাব্দ) নামে একজন গ্রীক গণিতজ্ঞ ভারতীয় গণিতবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লেখেন। তাহাতে তিনি নবাঙ্ক ও শূন্যের উল্লেখ করেন[৩]।

শব্দের সংখ্যাভেদ ও তজ্জনিত বিপর্য্যয়

কখন কখন দেখা যায়, একই শব্দ দুই বা ততোধিক সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হয়। এটা অতীব দোষের। মহাবীর ব্যতীত পুরাতন কোন গ্রন্থকারের এই দোষ ছিল না বোধ হয়। মহাবীরের মতে 'রত্ন' শব্দ ৩ ও ৯ দুইই বুঝাইতে পারে। সেরূপ দিক্=৮, ১০। কবিকল্পলতায় এই দোষ কিছু বেশী। যথা, অঙ্গ=৫, ৬; গুণ=৩, ৬; ভূষণ=৩, ১৪; দ্বীপ=৭, ১৮; বিদ্যা =১৪, ১৮, রস=৬, ৯; সমুদ্র=৪, ৭। রন্ধ্র শব্দের ভেদই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা হয়।

১। Early History of Arithmetic of Zero and Infinity, loc. cit., pp. 116-7.

২। J. Ginsburg, "New Light on our Numerals," *Bulletin of the American Mathematical Society*, vol. 23, 1917, p. 366; M. F. Nau in *Journal Asiatique*, series 10, vol. 16, 1910.

৩। Maximus Planudes, *Arithmetic after the Indian Method*, available in original Greek (Gerhardt, *Das Rechenbuch des Maximus Planudes*, Halle, 1865) and also in a German translation (H Waeschke, Halle, 1878). Quoted in Heath's *History of Greek Mathematics*, vol. II, Oxford, 1921, p. 547.

আমরা দেখিয়াছি, বৃহজ্জাতকের মতে রন্ধ্র = ৮ ; অপর সকলের মতে রন্ধ্র = ৯। দ্বারভাঙ্গার ধনুকা গ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখে আছে,—"শকে রন্ধ্রতুবঙ্গমে শ্রুতিমহীসংলক্ষিতে হায়নে"১। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে এখানে রন্ধ্র = ৮। রাণী ভবানী-প্রতিষ্ঠিত কোন শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-সন দেওয়া আছে,—"রন্ধ্রক্ষৌণ্যব্ধিচন্দ্রে শকপতিগণিতে"২। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহারের পাঠানুসারে রন্ধ্র = ৯। শেখ-শুভোদয়ার মতে রাজা রামপালের মৃত্যু হয় "যুগ্মকুশাম্বররন্ধ্রমিত" শাকে৩। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বলেন, রন্ধ্র = ০। এই স্থলে রন্ধ্র শব্দে যে ৮ বা ৯ হওয়া সম্ভব নহে, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাঠ শুদ্ধ। অপর দুই স্থলেও এই পাঠ গ্রহণ করিলে ৮।৯ বছরের পার্থক্য হয়, তাহা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বোক্ত শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-সনে 'অব্ধি' শব্দ ৪ অর্থে গ্রহণ করিলে রাণী ভবানীর সময় তিন শ বছর পিছাইয়া যাইবে। সুতরাং উহা অসম্ভব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ "সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দু" শকে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনা করেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির একটা পদাবলীতে আছে,৪ "সমুদ্দ কর (? পুব) অগিনী সসী"। এই উভয় স্থলে সমুদ্র শব্দের সংখ্যাভেদের জন্য সময়ের বেশী পার্থক্য হয় না। শ্রীরূপ গোস্বামী "চন্দ্রাশ্বিভুবনে শাকে" "উৎকলিকাবল্লরী" রচনা করেন। 'ভুবন' অর্থে ৩ ধরিলে তিনি ৩৭১ শকের লোক হইয়া পড়েন। গুরুর জন্মের হাজার বছরেরও অধিক পূর্ব্বে শিষ্যের জন্ম !

উপসংহার

পরিশেষে আমরা উপরের আলোচনাতে কি কি তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। শব্দসংখ্যা-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। তাহা এই দেশেই প্রথম উদ্ভাবিত হয় ; কোন বহিঃস্থ দেশ হইতে আসে নাই।

২। বেদে বস্তু জ্ঞাপনার্থ সংখ্যার উল্লেখ হইত।

৩। সংখ্যার্থ শব্দ ব্যবহারের প্রথম উৎপত্তি ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থাদিতে। কিন্তু ঐ প্রথাটা সম্যক্‌রূপে প্রণালীবদ্ধ হয় অনেক পরে।

৪। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য স্থানীয়মানের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ স্থানীয়মান সহ শব্দ ব্যবহার করিতেন।

৫। দশমিক সংখ্যাজ্ঞাপন-প্রণালী কৌটিল্য জানিতেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

১। J.A.S. B., vol XIV, 1918, p. 281, fn. 7.

২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বঙ্গাব্দ ১৩১৪, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

৩। *Indian Antiquary*, vol. XLIX, 1920, p 192 ; গৌড়রাজমালা, ভূমিকা, ৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

৪। পদাবলী, ৫৩১ পৃষ্ঠা, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, J A. S B vol. XI, 1915, p. 418.

গাজী সাহেবের গান*

প্রায় বিশ বর্ষের উর্দ্ধ হইল, মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয় 'হর-পার্ব্বতী-মঙ্গল' নামক একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের পরিচয় লিখিয়া পাঠান। তৎকালে আমি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। মূল গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হস্তগত না হওয়ায় গ্রন্থ-বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই। এই 'হর-পার্ব্বতী-মঙ্গলে' গ্রন্থকার এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

"জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদুন-মল্লানুরাগ
অধিপতি শ্রীমদন রায়।
নিজে মোবারক গাজী আপনি হইয়া রাজী
বনমাঝে দেখা দিলা তায়॥
সঙ্গেতে সহায় হয়ে নবাবে স্বপন ক'য়ে
শিরোপা পাইল জমিদারী।
দত্তকুল-সমুদ্ভব গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব
কায়স্থ কুলের অধিকারী॥
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ পঞ্চম তনয় নিজ
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব জমিদারী তাহে বর্ত্ত
তদঙ্গজ শ্রীদুর্গাচরণ॥
সহায় আনন্দময়ী সর্ব্বাংশে হইল জয়ী
শ্রীমতী 'শ্রীমতী' যার রাণী।
করিয়া সমাজস্থান কত ভূমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী॥
তস্য পুত্র গুণধাম শ্রীকালীশঙ্কর নাম
অল্পকালে হইল লোকান্তর।
তস্য পুত্র মহাশয় শ্রীরাজবল্লভ হয়
চৌধুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্তর॥
শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য ধরা অবিবাদে পালে ধরা
গাম্ভীর্য্যেতে রঘুপতি রাম।

---

* ১৩৩৫, ৬ই শ্রাবণ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অধিকার ইঙ্গরাজী কেহ করি কারসাজী
কিছু গ্রাম করায় নিলাম ॥
তার মধ্যে বাসস্থান হরিনাভি সমাখ্যান
কিনিলেন দুর্গারাম কর।
নহেন সামান্য ব্যক্তি গুরুদেব দ্বিজে ভক্তি
কীর্ত্তি কত দেশ দেশান্তর ॥
উভয়ত গুণ যোগী কিন্তু যার বৃত্তিভোগী
আশীর্ব্বাদ করি পুনঃ পুনঃ।
কবীন্দ্র মাতামহকুল ইষ্ট যার অনুকূল
পিতৃপরিচয় কিছু শুন ॥
মুখুটী বিখ্যাত কুলে মেলবন্ধ যাব কুলে
শঙ্করেব তনয় গোপাল।
ভরদ্বাজ মুনি অংশ কানাই ঠাকুর-বংশ
আদান প্রদানে সম ভাল ॥
তিন কুল ভঙ্গ নিজ মাহিনগরেতে দ্বিজ
কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান।
বিবাহ তনয়া তারি তাহাতে সন্তান চাবি
রামধন তৃতীয় সন্তান ॥
তদঙ্গজ বামচন্দ্র ইষ্ট চরণারবিন্দ
একান্ত হৃদয় মাঝে ভাবি।
বিনোদরাম সুতাসুত রচিল বিনয়যুত
সম্প্রতি নিবাস হরিনাভি ॥”

হরপার্ব্বতীমঙ্গলেব গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় হইতে জানা যাইতেছে, কবি রামচন্দ্র মুখটী বারুই-পুরের জমিদার রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর সময় এই গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত রাজবল্লভ রায়ের বৃদ্ধপিতামহ হইতেছেন,রাজা মদন রায়। এই মদন রায় মোবারক গাজীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন; এইটুকু পরিচয় হরপার্ব্বতীমঙ্গল হইতে পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে মদন রায় ও মোবারক গাজীর পবিচয় জানিবার একান্ত কৌতূহল জন্মে। তৎকালে বারুইপুরের জমিদার আমার বৈবাহিক (পরে পরলোকগত) দুর্গাদাস রায় চৌধুরী মহাশয়কে মদন রায় ও মোবারক গাজীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। তাঁহার নিকট জানিতে পারি, দক্ষিণ দেশে মুসলমান-সমাজে “গাজী সাহেবের গান” প্রচলিত আছে; তাহাতে রাজা মদন রায়ের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গাজী সাহেবের গান শুনিবার আমার একান্ত ইচ্ছা হয়। তৎপূর্ব্বেই 'রায়মঙ্গল'-গ্রন্থে দক্ষিণরায় ও বড়েখাঁ গাজীর বিবরণ পাইয়া বিশ্বকোষ ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ

করিয়াছিলাম। তৎকালে স্বর্গগত বন্ধুবর ব্যোমকেশ মুস্তফী রায়মঙ্গল-বর্ণিত দক্ষিণরায় ও বড়েখাঁ গাজীর ইতিহাস সংগ্রহে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মোবারক গাজীর সহিত বড়েখাঁ গাজীর কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিবার জন্ত আগ্রহ জন্মে। দুর্গাদাস বাবু আমার অনুরোধে কলেমুদ্দি গায়েনকে ডাকাইয়া গাজী সাহেবের গানের কথা বলেন। জমিদারের আদেশে সিতাঙ্গুনিবাসী কলেমদ্দী গায়েন আমাকে এক প্রস্থ "গাজী সাহেবের গান" বা "মোবারক গাজী সাহেবের উপাখ্যান" নকল করিয়া দিয়াছিলেন। আমার সংকল্প ছিল, আরও ২।১ প্রস্থ সংগ্রহ করিয়া, পাঠ মিলাইয়া, পরে গাজী সাহেবের গান প্রকাশ করিব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য-ক্রমে বহু চেষ্টাতেও আর এক প্রস্থ এত দিনেও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অবশ্য ২৪ পরগনায় প্রায় সকল জনবহুল মুসলমান-পল্লীতে গাজী সাহেবের আস্তানা আছে, বিশেষতঃ বারুইপুরের চৌধুরী জমিদারগণের যেখানে যেখানে জমিদারী আছে, সেখানে গাজী সাহেবের আস্তানা ও তাঁহার সম্মানার্থ হাজত দিবার ব্যবস্থা আছে। বারুইপুরের জমিদার ও স্থানীয় প্রজাসাধারণের বিশ্বাস, গাজী সাহেবের কৃপায় রায়চৌধুরীবংশের জমিদারী এখনও বজায় আছে।

হিন্দুমুসলমানের নিকট গাজী সাহেবের এরূপ অনন্যসাধারণ সম্মান লাভের কারণ কি, তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বহু চেষ্টাতেও আর এক প্রস্থ নকলের সুবিধা হইল না। এদিকে আমারও জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। দশ বর্ষের উপর গৃহমধ্যে আবদ্ধ আছি; এমন কি, শয্যাগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থাতে সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান হিতৈষী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু আমার নিকট একটী প্রবন্ধের তলব করিলে, তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষার জন্ত অদ্য আমার সংগৃহীত 'গাজী সাহেবের গান' নকল করাইয়া প্রকাশের জন্ত পাঠাইলাম।

হরপার্ব্বতী-মঙ্গলে কবির আত্মপরিচয় ও গাজী সাহেবের গান পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি, রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর পিতামহ দুর্গাচরণ প্রথম বারুইপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতা শ্রীরাম রায় ও পিতামহ রাজা মদনরায় রাজপুরে বাস করিতেন। রাজ-পুরে মদনরায়ের দ্বিতল বাড়ী ছিল, তাঁহার রাজার ন্যায় সম্মান ছিল। ঢাকার নবাবকে কর দিতে হইত। তখন মুর্শিদাবাদে নবাবের রাজধানী হয় নাই। খাজনা বাকি ফেলিলে ঢাকা হইতে নবাবী ফৌজ আসিয়া বাকিদার জমিদারগণকে ধরিয়া লইয়া যাইত। গাজী সাহেবের গানে লিখিত আছে,—

"নবাব বলে সেরেস্তাদার মেরা পানে চাও।
বাকি কেত্তা জমিদার বোলাইয়া দাও ॥
কাগজ দেখে সেরেস্তাদার এই কথা বলে।
মদন রায় নামে রাজা দক্ষিণ মেদনমল্লে ॥

তিন সন খাজনা বাকি কাগজে তাহার।
শুনিয়া নবাব জলে আগ বরাবর॥"

তাঁহার কত টাকা বাকি পড়িয়াছিল, এ সম্বন্ধে পরে লিখিত আছে,—

"কাগজ দেখেন গাজী নিরখিয়া আঁখি।
তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা মদনরায়ের বাকি॥"

নবাব তাঁহাকে ধরিবার জন্য -

"বার জন সেফাই চলে এক জমাদার।"

নবাবের এইরূপ কর্ম্মচারিগণ আসিয়া যথেষ্ট অত্যাচার করিত। অত্যাচারের ভয়ে তাহাদের সম্মুখে সহজে কেহ হাজির হইত না। গাজী সাহেবের গানে আছে,—

"রাজপুর বাজারেতে আসিয়া পৌঁছিল।
দেখে যত প্রজা সবে ভয়যুক্ত হল॥
কেহ বলে খুড়া জেঠা কেউ বলে ভাই।
নবাবের সেফাই এল কোথায় পলাই॥
কেহ বলে মহারাজে খবর দিতে হল।
কেহ বলে সিফাই কি ফকিরগণ এল॥
মুসলমান ফকির সবে এইরূপে বেড়ায়।
এসেছে ছয়লাপে বুঝিনু নিশ্চয়॥
কেহ বলে ফকির যদি ইহারা হইবে।
পঞ্চ হাতিয়ার কেন সঙ্গেতে থাকিবে॥
যুদ্ধের সাজ সেজে এল বুঝিনু নিশ্চয়।
ফকির কখনও নয় সিফাই নিশ্চয়॥
চল সবে দেখা করি তাহাদের সাথে।
সিফাই হইলে কিন্তু মোট দিবে মাথে॥
পেয়াদার বোঝা বয়ে যাইতে হইবে॥"

এদিকে সেফাইগণ আসিয়া পড়িল, প্রজাগণ আর যায় কোথা? জমাদার তাহাদিগকে মদন রায়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। ভয়ে ভয়ে তাহারা মদনরায়ের বাড়ী দেখাইয়া দিল। এ দিকে প্রজাগণ তাড়াতাড়ি আসিয়া মদনরায়কে সংবাদ দিল, নবাবের ফৌজ তাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছে। সে সংবাদ পাইয়া রাজা মদনরায় থরথর কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন ফরিদ নস্কর।

মন্ত্রী বলে মহারাজ ভয় না করিবে।
কাছারী হইতে উঠে লুকাইতে হবে॥

মদন রায় বলেন আমার ভাগ্যে এই ছিল।
মেদনমল্লের রাজা হয়ে পালাইতে হল॥"

এখন রাজা মদনরায় আর করেন কি? অন্তঃপুরে গিয়া তিনি পলাইয়া রহিলেন। এ দিকে সিফাই আসিয়া সদর-দরজায় পৌঁছিল, দরজাতে লাঠি সোটা মারিতে লাগিল। ভাব গতিক দেখিয়া রাজার প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহার দেওয়ানজী মহেশ ঘোষকে সিফাইদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দরজায় আসিয়া,—

'মহেশ ঘোষ বলে আমি দেওয়ান রাজার।
এ কথা শুনিয়া রাগে কহে জমাদার॥
মহারাজ কাহা তেরা দেহ পরিচয়।
পলাইয়া গেছে কিম্বা লুকাইয়া রয়॥
জোড় হস্ত করি তখন মহেশ ঘোষ বলে।
তিন দিবস গিয়াছেন দক্ষিণ পেঁচাকুলে॥
সেখানেতে তালুক আছে তোমরা জান না।
তিন দিনের পথ সেই পেঁচাকুল পরগণা॥"

জমাদার মহেশ ঘোষের কথা বিশ্বাস করিল না, মহেশ ঘোষের অনেক কাকুতি মিনতি শুনিল না। শেষে মহেশ ঘোষকে চাঁপাগাছে লটকাইয়া বেত মারিতে হুকুম দিল। বেত খাইয়া মহেশ ঘোষ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মদনরায় দোতলার উপরে বসিয়া তাহা দেখিলেন; তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন,—

"মন্ত্রী বলে মহারাজ না করিও ভয়।
কিছু টাকা খরচ করিলে বড় ভাল হয়॥
আসামীর কাছে যদি ওরা টাকা কিছু পায়।
যুক্তি পরামর্শ কত বলে কয়ে দেয়॥"

মন্ত্রী ২৮৲ টাকা লইয়া, মোবারক গাজীর নাম স্মরণ করিয়া জমাদারের নিকট হাজির হইলেন। জমাদার মন্ত্রীকে দেখিয়াও অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। প্রত্যেকে টাকা পাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তখন জমাদারকে মন্ত্রী বলিলেন, মদনরায় তিন দিন পরে পেঁচাকুল হইতে ফিরিয়া আসিবেন। জমাদার সন্তুষ্ট হইয়া দশ দিন সময় দিল। মন্ত্রী মহেশ ঘোষকে আনিয়া রাজা মদনরায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন,—

"আদা ছেঁচে আদার জল মুখে দিতে যায়।
বাবাজী বাবাজী বলে ডাকে উভরায়॥
দেওয়ানজী অজ্ঞান হয়ে আছে মার খেয়ে।
আদা ছেঁচে দিও বাবা তব নাম লয়ে॥

সেলাম করেন মন্ত্রী গাজীর চরণে।
আদায় জল দিতে গেল দেওয়ানজীর বদনে ॥
অন্তর্যামী মোবারক অন্তরে জানিল।
গাজীর দয়ায় তাহার চৈতন্য হইল ॥
উঠিয়া দাঁড়ায় তখন রাজার সম্মুখে।
অবাক্ হইল রাজা দেওয়ানজীকে দেখে ॥"

রাজা ত অবাক্। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, একমাত্র গাজী সাহেবের কৃপায় মহেশ ঘোষ প্রাণ পাইয়াছে। মদনরায় মোবারক গাজীর এই প্রথম পরিচয় পাইলেন। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার এই দারুণ বিপদের সময় গাজী সাহেব ভিন্ন আর উপায় নাই। তখনই মন্ত্রীর পরামর্শে সির্ণির জোগাড় হইল। সেই সির্ণির হাড়ী লইয়া রাজা মদনরায় প্রভাতে উঠিয়া পিড়কির দ্বার দিয়া পালকীতে চড়িয়া গাজী সাহেবের দর্শনে চলিলেন,—

"রাজপুর নিজবাটী পশ্চাৎ করিয়া।
সোনারপুর গ্রামে রাজা উত্তরিল গিয়া ॥
সোনারপুর থেকে রাজা হলেন বিদায়।
নওয়াভাসানের ঘাটে এসে উপনীত হয় ॥
নওয়াভাসানের ঘাটে রাজা পার হইয়াছিল।
গৌড়দহ কাছারি পাছে উপনীত হল ॥"

এখানে আসিয়া রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কত দূর যাইতে হইবে? দূর হইতে মন্ত্রী রাজাকে নিশান দেখাইয়া কহিলেন, বনমধ্যে ঐ যে নিশান দেখা যাইতেছে, ঐখানে গাজী সাহেবের মোকাম। রাজা কহিলেন, এই বনের মধ্যে বাঘ আছে, কিরূপে ইহার মধ্যে যাইব? মন্ত্রী কহিলেন, কোন চিন্তা নাই, বাবাজীর দোহাই দিলে বাঘ দূরে পলাইয়া যায়। পাল্কী চড়িয়া গেলে তাঁহার সহিত দেখা হইবে না। পাল্কী হইতে সির্ণির হাড়ী আপনাকে মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এ দিকে ভক্তকে ছলনা করিবার জন্য গাজী সাহেব পঞ্চম বৎসরের বালক হইয়া রহিলেন। রাজার বিশ্বাস হইল না যে, তিনি গাজী সাহেব। রাজা গাজী সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন,—

"কাঙ্গালেরা এই ছেলে ফেলিয়া গিয়াছে।
সির্ণি খাবার লোভে এই ছেলে বসে আছে ॥"

মন্ত্রী বুঝাইয়া বলিলেন, ইনিই গাজী সাহেব, ইঁহার চরণবন্দনা করুন। তখন রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গাজীর চরণ ধরিলেন, গাজী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথায় পদধূলি দিলেন। মদন রায়ের প্রতি অনুমতি হইল, "আমার পুকুরে গিয়া খানিকটা মাটি কাট।" গাজীর

আদেশে মদন রায় কোঁড়াদারের নিকট হইতে কোদালি লইয়া মাটি কাটিবার জন্ম পুকুরে নামিলেন, তিন কোপের সময় তাঁহার কাপড় খুলিয়া গেল। তখন,—

"কোদাল রেখে মদন রায় কাপড় পড়্‌তেছিল।
মদন রায়কে ডেকে গাজী কহিতে লাগিল॥
তিন কোপ মাটি কাট্‌লে রাজা মদন রায়।
তিন পুরুষ জমিদারী রহিবে নিশ্চয়॥"

গাজীর মুখে এই কথা শুনিয়া মদনরায় অবাক্ হইলেন। তিনি পায়ে ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি কবিতে লাগিলেন। তখন গাজী সাহেব বলিলেন, আমার বাক্য অন্তথা হইবার নয়। তবে—

"পোষ্য পুত্র রাখিলে তোমাব তালুক রক্ষা হবে॥
যত দিন নাম মম রবে মেদনমল্লে।
তত দিন দুঃখ নাহি পাবে কোন কালে॥"

তখন গাজী বলিয়া দিলেন, তোমাব আর ভয় নাই। তুমি যাইবামাত্র দবজাতে সকলে তোমাকে সেলাম করিবে, তোমার সঙ্গে চাকবরূপে ঢাকা যাইবে, তোমার মকদ্দমা ফতে হইবে। মঙ্গলবারে যাত্রা করিবে এবং শুক্রবাবে তোমার উদ্ধাব হইবে। তখন মদন রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"মোকদ্দমা করে দেন বড করেন হিত।
মসজিদ্ মোকামে দিব সোনা রূপার চিত॥
সাত খানিস দিয়া তব নামে হাজত দিব।
গান বাইন ডেকে তব গান করাইব॥
মোবারক বলে বাবা আমার বাক্য লবে।
তোমা হইতে নাম মম জাহির হইবে॥
মুর্শিদের নামে সির্ণি হাজত করিয়া।
মদন রায়ের হস্তে দিল প্রসাদি বলিয়া॥
সির্ণির হাড়ী মদন রায় মাথায় লইল।
সেলাম করিয়া তবে বিদায় হইল॥
ঘুটারী সেরিফ হইতে হলেন বিদায়।
গৌড়দহ কাছারিতে উপনীত হয়॥
গাজীর স্মরণ রাজা মনেতে করিয়া।
বিদায় হইলেন রাজা পাল্কীতে বসিয়া॥

বেহারা লইয়া পাল্কী দ্রুত বেগে যায়।
নিমতলার ঘাটে এসে উপনীত হয় ॥
নিমতলার ঘাট রাজা পার হয়ে ছিল ;
পুঁড়ী বেগমপুর রাজা মদন রায় এল ॥
পুঁড়ী বেগমপুর হতে রাজা হলেন বিদায়।
রাজপুর নিজ বাড়ী উপনীত হয় ॥”

মদন রায়কে পাল্কীতে চড়িয়া আসিতে দেখিয়া প্রথমে জমাদার পেয়াদাগণকে ডাকিয়া একটু হাঁকাহাঁকি করিয়াছিল, কিন্তু মদনরায় গাজীকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি সোনার ভ্রমর হয়ে রাজার হস্তে বসিলেন এবং গুন্ গুন্ স্বরে অভয়বাণী দিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা মদনরায় অন্তঃপুরে পাল্কী চড়িয়া চলিলেন। এ দিকে বার জন সিফাই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। জমাদার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া কোন উত্তর পাইল না।

“জমাদার ডাকে তারা উত্তর নাহি দিল।
দেখে মন্ত্রী ফরিদ নস্কর রাজার কাছে গেল ॥”

যাহা হউক, বাবাজীকে স্মরণ করিবামাত্র ১২ জন সিফাইয়ের জ্ঞানোদয় হইল। রাজা ঢাকায় যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে পাল্কী চড়িয়া নাগরা ও নিশান লইয়া বহু লোক সঙ্গে চলিল। যে পথে মদন রায় ঢাকায় গিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ বর্ণিত আছে,—

রাজপুর নিজবাটী পশ্চাৎ করিল।
সোনারপুর গ্রাম রাজা গিয়ে উত্তরিল ॥
সোনারপুর থেকে রাজা হলেন বিদায়।
টালিগঞ্জে গিয়ে তখন উপনীত হয় ॥

* * * *

টালিগঞ্জে মহারাজ তাঁবু ফেলে রয়।
সেই রাত প্রভাত হল বড়ই সকালে ॥

* * * *

পাল্কি চড়ে মহারাজ করিল গমন।
গাজী সাহেবের নাম করিয়া স্মরণ ॥
টালিগঞ্জ হতে রাজা হইলেন বিদায়।
কালীঘাটে গিয়া তখন উপনীত হয় ॥
কালীঘাট মহামায়ী বামেতে রাখিয়া।
কলিকাতা মহারাজ পৌছিল যাইয়া ॥
কলিকাতা মহারাজ পশ্চাৎ করিল।
বরানগর চিৎপুর উপনীত হল ॥

বরানগব চিৎপুর পার হয়ে যায়।
ফরাসডাঙ্গাতে গিয়া উপনীত হয় ॥
ফরাসডাঙ্গা মহাবাজ পশ্চাৎ করিল।
আনওয়ারপুরে গিয়া তখন উপনীত হল ॥
এইরূপে তিন মাস পথে চলে যায়।
ঢাকার সহরে গিয়া উপনীত হয় ॥"

ঢাকায় আসিয়া রাজা মদনরায় ছয় দণ্ডের পথে তাঁবু ফেলিয়া রহিলেন এবং মনে মনে গাজীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে গাজীর আসন টলিল। তিনি রাত্রিকালে ঢাকার সহরে আসিয়া স্বপ্নে নবাবকে দেখা দিলেন ও তাঁহাকে কহিলেন,—

"উঠ উঠ নবাব আউলে হও রে চিতন।
শিহবে মোবারক গাজী ঘুমে এত মন ॥
আল্লা মোরে ক'রিয়াছেন জাহিরের পীর।
মায়াজালে রহিলাম বন্দী না হইল জাহির ॥
আমার নাম মোবারক গাজী নেও রে পরিচয়।
কাল প্রভাতে আসবে হেস্তা রাজা মদনরায় ॥
শাল শিরোপা পাল্কী দিয়া তারে উলাইবে।
চড়নের ঘোড়া তোমায় বক্‌সিস্ করিবে ॥
আর এক বাত নবাব শুন হকিকত।
পরোয়ানা লিখিয়া দিবে বেসবিকত ॥
খেতাবী করিবে বিদায় মদন রায়ের করে।
আমার মোকাম হবে ঘুটাবী মাঝারে ॥"

নবাব গাজী সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইলেন। ইহার পর গাজী নবাবের দপ্তরখানায় গিয়া প্রবেশ করিলেন,—

"কাগজ দেখেন গাজী নিরখিয়া আঁখি।
তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা মদন রায়ের বাকি ॥"

* * * *

"ডাইনের বাকি লয়ে বামে ফেলে দেয়।
কাগজ সারিয়া গাজী হলেন বিদায় ॥"

পরদিন নবাব শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। ফজরের নমাজের পর উজীর নাজীর প্রভৃতি আসিয়া নবাবের সঙ্গে দেখা করিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে স্বপ্নের কথা জানাইলেন। তাঁহাদের পরামর্শে মদনরায়কে আগ বাড়াইয়া আনিবার জন্ত হাতিয়ার লইয়া পঞ্চাশ জন সিফাই চলিল। প্রথমেই সিফাই দেখিয়া মদনরায় বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। তৎপরে যখন বুঝিলেন,

তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইবার জন্য তাহারা আসিয়াছে, তখন মহাসমারোহে মদনরায় পাল্কীতে চড়িয়া নবাব-দরবারে আসিলেন। নবাব মদনরায়কে নিজের ডাইন দিকে বসাইয়া সম্মানিত করিলেন, পরে নিজের হাতে নবাব বেসরিকতের পাট্টা সহি করিয়া দিলেন। এ সময়ে কয়েক জন ভূঞা জমিদার ঢাকার কারাগারে বন্দী ছিলেন। মদনরায় যখন কার্য্যোদ্ধার করিয়া ফিরিতেছিলেন, সেই সময় জেলখানার নিকটে কয়েদী আসামীগণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দারোগাকে হাজার টাকা ঘুষ কবুল করিয়া মদনরায়ের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহাদের অনুনয় বিনয়ে ও মন্ত্রীর পরামর্শে মদনরায় আবার ফিরিয়া নবাবের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তখন নবাব তেল মাখিতেছিলেন। দূর হইতে মদনরায়ের পাল্কী দেখিয়া তাঁহার ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে মদনরায় জানাইলেন,—

"ভাবিত হইয়া কহে রাজা মদনরায়।
বার ভূঞে জমিদার ধরেছে আমায়॥
নবাব আউলে ডেকে বলে শুন বাবাজী।
কয়েদে আসামীর উপায় তুমি করবে কি॥
মদনরায় বলে আমি ধর্ম্ম প্রমাণ কব।
বার ভূঞে জমিদারের জামিন হয়ে রব॥"

তখন নবাব আদেশ করিলেন যে, তুমি জেলখানায় গিয়া কয়েদী আসামীদের হাতের বেড়ী স্বহস্তে কাটিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার কর। তখন মদনরায় জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। এ দিকে—

"মোবারক বলে দুখি শুন বাবাজী।
অদৃষ্টে লিখন তাহার আমি করব কি॥
ভাগ্যে তাহার লেখা আছে জেলে যেতে হবে।
আড়াই ঘণ্টা মদনরায় জেলখানাতে রবে॥
মোবারক গাজীর কথা রদ নাহি হল।
বেড়ী কাটতে মদনরায়ের আড়াই ঘণ্টা গেল॥
একে একে বাহির করে যত জমিদারে।
শেষকালে মদনরায় আইল বাহিরে॥
জমিদারে হাজতের টাকা চাঁদা তুলে দেয়।
এক হাজার টাকা তখন হাজতের হয়॥
গাজীর স্মরণ করে যে যার বাটীতে যায়।
পাল্কী চড়ে হলেন বিদায় রাজা মদনরায়॥

ঢাকা হতে রাজমিস্ত্রি সঙ্গে করে নিল।
গাজীর স্মরণ করে পথেতে চলিল॥
একাক্রমে দুই সপ্তা একা পথে চলে।
কলিকাতা এসে রাজা এই কথা বলে॥"

বলিতে কি, মদনরায় গাজীর কৃপায় তিন মাসের পথ দুই সপ্তাহে আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া রাজা এক হাজার টাকার মিঠাই কিনিয়া লইয়া গাজী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। মোবারক গাজী মদনরায়কে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মদনরায় মস্‌জিদের স্থান দেখিতে চাহিলেন এবং মস্‌জিদের স্থান দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মদনরায়ের উৎকৃষ্ট সাতটা খাসী লইয়া গাজী সাত হাঁড়ী মাংস সাতটি উনুনে বসাইলেন ও মুর্শিদের নামে হাজত করিয়া দিলেন। পরে সকলকে সিন্নি দিয়া মদনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে মদন রায়ের দ্বারা মোবারক গাজীর নাম সর্ব্বত্র জাহির হইয়াছিল।

হণ্টার সাহেব (Statistical Account of Bengal, vol. I, p 119) বিদ্যাধরী নদী-তীরস্থ হাসাডা গ্রামের বিবরণ উপলক্ষে মোবারক গাজীর কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তিনি The Revenue Surveyor's Report হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে, "মেদনমল্ল পরগণার অধিকাংশ স্থানই বন্য জন্তু-সমাকীর্ণ জঙ্গলে আবৃত ছিল। এ সময়ের জমিদার সদানন্দ রায় চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীর বাদশাহের নিকট এই পরগণার সনন্দ পান। বাঁশড়ার জঙ্গলে মোবরা গাজী নামে এক ফকির বাস করিতেন। বন্য পশুগণের উপর তাঁহার অসীম প্রভুত্ব ছিল। এমন কি, তিনি সর্ব্বদাই বাঘে চড়িয়া জঙ্গলে বেড়াইতেন। জমিদারের খাজনা বাকী পড়ায় তাঁহাকে দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া যায়। জমিদারের মা ফকিরের শরণ লন। মোবরা গাজী দিল্লীশ্বরকে দেখা দিয়া বলিলেন, তিনিই হইতেছেন জঙ্গলের মালিক, জঙ্গলের মধ্যেই তাঁহার টাকা রহিয়াছে। জমিদারকে ছাড়িয়া না দিলে তাঁহার (বাদশার) ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। স্বপ্নে ভীত হইয়া বাদশাহ জমিদারকে মুক্তি দান করিলেন এবং লোকজন সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে মেদনমলে পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে বলিয়া দিলেন, জঙ্গলে গাজীর যে গুপ্ত ধন আছে, তাহা উদ্ধার করিয়া দিল্লীতে যেন পাঠান হয়। জমিদার গৃহে আসিয়া মাতাকে সমস্ত কথা জানাইলেন। তাঁহার মাতা গাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া, গুপ্ত ধনের কথা জানাইলে গাজী তাঁহাকে গুপ্তধন দেখাইয়া দেন ও তাহা লইয়া যাইতে আদেশ করেন। মাতা ও পুত্র, উভয়ে মিলিয়া সেই গুপ্তধন লাভ করেন। তাহার কতক অংশ দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন এবং অধিকাংশ নিজেরা হস্তগত করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জমিদার গাজীর জন্য একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে অগ্রসর হন। গাজী স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলেন, তাঁহার মস্‌জিদে প্রয়োজন নাই। যে কোন ব্যক্তি জঙ্গলে কাঠ কাটিতে আসিবে, তাহাদের প্রত্যেকের পূজাই তিনি চান। তখন জমিদার হুকুম দিলেন যে, তাঁহার জমিদারীর প্রতি গ্রামে মোবরা গাজীর আস্তানা নির্ম্মিত

হইবে এবং সর্ব্বসাধারণে তাঁহার পূজা করিবে। কেবল মেদনমল পরগণা বলিয়া নহে, সুন্দরবন-সন্নিহিত সকল পরগণাতেই মোবরা গাজীর আস্তানা দেখা যায়।"

হণ্টার সাহেব যে রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কল্পনা-প্রসূত ; গাজী সাহেবের গানে প্রকৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বাঁশড়ার জঙ্গলে যেখানে মোবারক গাজী মোকাম করিয়াছিলেন, সেই স্থান 'ঘুটিয়ারী সরিফ' নামে প্রসিদ্ধ, ই, বি, রেলওয়ের দক্ষিণ শাখার পোর্ট ক্যানিং যাইবার পথে একটী ষ্টেশন, শিয়ালদহ হইতে ১৯½ মাইল দূরে অবস্থিত। গাজীর উদ্দেশ্যে মানত করিয়া হিন্দু মুসলমান বহু যাত্রী সর্ব্বদাই এখানে আসিয়া থাকে। মেলার সময় গাজী সাহেবের গান হয় এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে।

গাজী সাহেবের গানের যে নকল পাইয়াছি, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে মনে হইবে, ঢাকার নবাবী আমলে মোবারক গাজী ও রাজা মদনরায়ের অভ্যুদয়। ১৭শ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নবাব নাজিমের রাজধানী পত্তন হয়। সুতরাং তৎপূর্ব্বে গাজী সাহেবের নাম জাহির হইয়াছিল। রাজা মদনরায়ের অষ্টম পুরুষ অধস্তন স্বর্গীয় দেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে রাজা মদনরায় ঢাকায় গিয়াছিলেন। তৎকালে নবাবের কর্ম্মচারিগণ সাধারণের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত,জমিদারেরাও কিরূপ খাজনা বাকি ফেলিতেন, মুসলমান ফকিরগণের হিন্দু মুসলমান সকলের উপর কিরূপ প্রভুত্ব ছিল, হিন্দু বড়লোকেও মুসলমান পীর ও গাজীকে কিরূপ সম্মান করিতেন, মোবারক গাজীর কিরূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, তাহা এই গাজী সাহেবের গানে বর্ণিত হইয়াছে। এই গানের ভাষায় গায়েন ও নকলকারীর দোষে আধুনিক ছাপ পড়িলেও ইহার মধ্যে ইংরাজ-প্রভাবের কোন নিদর্শন নাই। মুসলমানের রচনা ও মুসলমান গায়েনেরা এই গান সর্ব্বত্র সুরলয়-যোগে গাহিলেও ইহাতে সেরূপ মুসলমানী উর্দ্দু ভাষার ছাপ পড়ে নাই। গোছল, সিরণী, হাজত, মুর্শিদ, হাকিকত, বেসবিকৎ, আউলে, তলব, এরূপ সামান্য কয়েকটি শব্দ ভিন্ন সর্ব্বত্রই ২৪ পরগণার খাঁটি বাঙ্গালা। এরূপ গান বঙ্গের নানা স্থানে হিন্দু ও মুসলমানসমাজে নানা হীন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, সেই সকল সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। এই সকল গ্রাম্য-গীতি হইতেও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সমাজের রীতি নীতি, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসের ক্ষীণ স্মৃতি বাহির হইতে পারিবে।

গাজী সাহেবের গান

আরম্ভ

মোবারক বলেন দুঃখী শুন ফরমান।
ঘুটারিতে সরোবর করিব নির্ম্মাণ॥
এখনি যাইব আমি মক্কার সহরে।
পানি আনিব আমি হওয়জ কওপুরে॥
সেই পানি এনে আমি পুখুরে রাখিব।
মক্কা বলিয়া আমি প্রচার করিব॥
আসিয়া পুখুরে সবে করিবে গোছল।
মনের বাসনা তাদের হইবে সফল॥
যাত্রী লোকে এই কথা সকলে জানিবে।
গোছল করিবে সবে পদ নাহি ধোবে॥
যাও দুখী খবর কর সকলকার কাছে।
পুখুর কাটিবে বাবা মনেতে করেছে॥
এই কথা শুনে দুখী খবর করে গিয়া।
মাটি কাট্তে সবে যায় কোদালী লইয়া॥
চৌহদ্দি করিয়া গাজী দেখাইয়া দিল।
মাটি কাট্তে কোড়াদার পুকুরে ভেজিল॥
এলাহি ভাবিয়া গাজী মক্কা তৈয়ার করে।
নবাব আসিয়া বসে ঢাকার সহরে॥
নবাব বলে সেরেস্তাদার মেরা পানে চাও।
বাকি কেত্তা জমিদার বোলাইয়া দেও॥
কাগজ দেখে সেরেস্তাদার এই কথা বলে।
মদনরায় নামে রাজা দক্ষিণ মেদনমলে॥
তিন সন খাজনা বাকী কাগজে তাহার।
শুনিয়া নবাব জলে আগ্ বরাবর॥
এত্তা বড় জমিদার এত্তা জোর ধরে।
তিন সন খাজনা বাকি আমার সরকারে॥
আন সেই জমিদার হাতে রশি দিয়া।
বার জন সেফাই সাজে এ কথা শুনিয়া॥
বার জন সেফাই চলে এক জমাদার।
আইল তলবে সবে হয়ে রাহাদার॥
একাক্রমে তিন মাস পথে চলে এলো।
কলিকাতায় এসে সবে উপনীত হলো॥
কালীঘাট মহামায়ী দেখিবারে পায়।
প্রণাম করিয়া সবে এই কথা কয়॥
জগতজননী মাগো প্রণাম করি পায়।
যাবা মাত্র পাই যেন রাজা মদনরায়॥
যাবামাত্র জমিদারে যদি লাগ পাব।
ফেরতা কালে চরণেতে বিল্বপত্র দিব॥
কালীঘাটে জমাদার এই কথা কয়।
ঘুটারিতে মোবারক অন্তরে টের পায়॥
অন্তর্যামী গাজী সাহেব অন্তরে জানিল।
দুখী দুখী বলে গাজি ডাকিতে লাগিল॥
ছালাম করিয়া দুখী এই কথা কয়।
কি কারণে বাবাজী গো ডাকিলে আমায়॥
গাজী বলেন তবে দুখী বলি তব কাছে।
মদনরায়ের তলবেতে পিয়াদা এসেছে॥
যদি তারা মহারাজের হাতে রশি দিবে।
আমাকে বাবাজী বলে কেহ না ডাকিবে॥
দুখী বলে বাবাজী গো শুন দয়াময়।
বলুন দেখি মহারাজের কি হবে উপায়॥
এ কথা শুনিয়া গাজী কহেন দুখীরে।
আসে যদি আশীর্ব্বাদ করিব তাহারে॥

তব আশীর্ব্বাদে তাহার কি ফল হইবে।
গাজী বলে মোকদ্দমা ফতে হয়ে যাবে ॥
বাপ বেটা দুয়ে মিলে এই কথা কয়।
কালীঘাট হইতে সিফাই হইল বিদায় ॥
রাজপুর বাজারেতে আসিয়া পৌঁছিল।
দেখে সবে প্রজা সবে ভয়যুক্ত হল ॥
কেহ বলে খুড়া জেঠা কেউ বলে ভাই।
নবাবের সিফাই এল কোথায় পালাই ॥
কেহ বলে মহারাজে খবর দিতে হলো।
কেহ বলে সিফাই কি ফকিরগণ এলো ॥
মুসলমান ফকির সবে এইরূপে বেড়ায়।
এসেছে ছয়লাপে বুঝিনু নিশ্চয় ॥
কেহ বলে ফকির যদি ইহারা হইবে।
পঞ্চ হাতিয়ার কেন সঙ্গেতে থাকিবে ॥
যুদ্ধের সাজ সেজে এলো বুঝিনু নিশ্চয়।
ফকির কখন নয় সিফাই নিশ্চয় ॥
চল সবে দেখা করি তাহাদের সাথে।
সিফাই হইলে কিন্তু মোট দিবে মাথে ॥
পেয়াদার বোঝা বয়ে যাইতে হইবে।
ছাতা জুতা বস্ত্রাদি মাথায় তুলে দিবে ॥
একথা বলিয়া সবে দাঁড়াইয়া রয়।
আসিয়া জমাদার পথে ধরিল সবায় ॥
কাহারা কোথায় যাবে বাটী কোন্ স্থানে।
এখানে দাঁড়াইয়া কিসের কারণে ॥
প্রজাগণ বলে মোরা গোমস্তা মুহুরী।
ব্রহ্মত্তর তালুক আছে খাজনা তহশীল করি ॥
জমাদার বলে তুমি মেরা পানে চাও।
কোন জমিদার তেরা পরিচয় দাও ॥
প্রজাগণ কহে আসি যোড়হস্ত করি।
বেহালা নিবাস রাজা সাবর্ণ চৌধুরী ॥
জমাদার বলে গিধি মেরা পানে চাও।
মদনরায়ের বাড়ী কোথা দেখাইয়া দেও ॥
মহারাজের বাড়ী সবে দিল দেখাইয়া।
প্রাণের ভয়েতে সবে গেল পলাইয়া ॥
কাছারিতে বসে আছে রাজা মদনরায়।
দড়বড়ি প্রজা আসি এই কথা কয় ॥
কি করেন মহারাজ নিশ্চিন্তে বসিয়া।
সিফাই দেখিয়া আইনু খবর লইয়া ॥
একথা শুনিয়া রাজার প্রাণ উড়ে যায়।
মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলে কি করি উপায় ॥
নবাবী ফউজ এল আমার তলবে।
একথা বলিয়া রাজা থর থরে কাঁপে ॥
ত্রাসযুক্ত হয়ে রাজা জ্বর এল গায়।
কি করি উপায় মন্ত্রি বল না আমায় ॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ ভয় না করিবে।
কাছারি হইতে উঠে লুকাইতে হবে ॥
মদনরায় বলে আমার ভাগ্যে এই ছিল।
মেদনমল্লের রাজা হয়ে পলাইতে হলো ॥
শুন শুন ও বাপ মন্ত্রি আমার কথা শুন।
পলাইয়া গেলে আমার মান্য রবে কেন ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ কাছারিতে রবে।
দেখিতে পাইলে তারা হাতে বন্দি দিবে ॥
মহারাজ বলে তারা মান্য না করিবে।
বলুন দেখি মহারাজ মান কোথা রবে ॥
একথা শুনিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল।
মানের ভয়েতে তখন অন্তঃপুরে গেল ॥
অন্তঃপুরে মহারাজ লুকাইয়া রয়।
পিয়াদা আসিয়া সবে দ্বারেতে পৌঁছায় ॥
মদনরায় ব'লে সবে ডাকিতে লাগিল।
লাঠি সোটা দরওয়াজাতে মারিতে লাগিল
শুনে রাজা মদনরায়ের প্রাণ উড়ে যায়।
বল বল ও বাপ মন্ত্রি কি হবে উপায় ॥
দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া বুঝি আসে অন্তঃপুরে।
কি করি উপায় মন্ত্রি বল না আমারে ॥

মন্ত্রী বলে মহারাজ ভয় না করিবে।
দরওয়াজাতে দেওয়ানজিকে পাঠাইতে হবে॥
একথা শুনিয়া রাজা চারি দিকে চায়।
মহেশ ঘোষকে ডেকে তখন এই কথা কয়॥
শুন শুন মহেশ ঘোষ আমার পানে চাও।
বিপদ সময় একবার দরওয়াজাতে যাও॥
মহেশ ঘোষ শুনে বলে যোড়হাত করি।
আপনার চাকুরীতে অস্বীকার করি।
যমের সঙ্গে করব দেখা দরওয়াজাতে গিয়া।
প্রাণদণ্ড হবে মম দেখুন বুঝিয়া॥
মন্ত্রী বলেন দেওয়ানজি না করিবেন ভয়।
বিপদে পড়েছে আজি রাজা মহাশয়॥
বিপদকালেতে যদি উদ্ধার না করিবে।
এ বিপদে মহারাজ কিসে ত্রাণ পাবে॥
দেওয়ানজি বলেন মন্ত্রি শুন দয়াময়।
কেমনে চলিয়া যাব শক্তি নাহি গায়॥
ভগবতীর ধ্যান ক'রে দ্বারেতে যাইবে।
বিপদনাশিনী কালী উদ্ধার করিবে॥
একথা শুনিয়া তবে করিল গমন।
জগৎজননী মাগো দিও শ্রীচরণ॥
তোমা বিনা উদ্ধারিতে কেহ মম নাই।
বিপদকালেতে যেন রাঙ্গাচরণ পাই॥
একথা বলিয়া দ্বারে গেলেন চলিয়া।
জমাদার জিজ্ঞাসিল ক্রোধান্বিত হইয়া॥
কোন আদমী মহারাজকো দেহ পরিচয়।
কিসের লাগিয়া হেতা এলে দরওয়াজায়॥
মহেশ ঘোষ বলে আমি দেওয়ান রাজার।
একথা শুনিয়া রাগে কহে জমাদার॥
মহারাজ কাঁহা তেরা দেহ পরিচয়।
পলাইয়া গেছে কিম্বা লুকাইয়া রয়॥
যোড়হস্ত করি তখন মহেশ ঘোষ বলে।
তিন দিবস গিয়াছেন দক্ষিণ পেঁচাকুলে॥
সেখানেতে তালুক আছে তোমরা জান না।
তিন দিনের পথ সেই পেঁচাকুল পরগণা॥
জমাদার বলে গিধি মেরা পানে চাও।
হাজীর কর মহারাজকে যদি প্রাণ বাঁচাও॥
মহেশ ঘোষ বলে তখন ভাবিত হইয়া।
কেমনে এখনে দিব হাজির করিয়া॥
মহারাজের কাছে দিব চিঠি পাঠাইয়া।
আসিবেন মহারাজ খবর পাইয়া॥
একথা শুনিয়া রাগে কহে জমাদার।
মিথ্যা কথা বলিলে সঙ্গেতে আমার॥
মহারাজ লুকাইয়া আছে অন্তঃপুরে।
মিথ্যা কথা হারামজাদ কহ কি খাতেরে॥
একথা শুনিয়া তখন হাতে রশি দেয়।
পিয়াদাকে ডেকে তখন এই কথা কয়॥
জমিদার গরহাজির আছে হাতে দেও দড়ী।
চাঁপাগাছে লট্‌কাইয়া মার বেতের বাড়ী॥
বাটীর সম্মুখে দুইটী চাঁপাগাছ ছিল।
দুই হাতে রশি দিয়া লট্‌কাইয়া দিল॥
প্রথমে মারিল বেত মহেশ ঘোষের গায়।
ধুলায় পড়িয়া তখন গড়াগড়ি যায়॥
মহেশ ঘোষ কেন্দে বলে বিনয় করিয়া।
বিনা দোষে মার আমায় কি দোষ পাইয়া॥
জমাদার বলে হাজির কর জমিদারে।
নতুবা এখনই দিব যমালয়ে তোরে॥
বাড়ির উপরে বাড়ি মারে নির্দ্দয় হইয়া।
মহেশ ঘোষ কান্দে তখন ধুলায় পড়িয়া॥
দশ বেতে মহেশ ঘোষ অজ্ঞান হইল।
মৃতপ্রায় সেইখানে পড়িয়া রহিল॥
দোতালা উপরে ব'সে দেখে মদনরায়।
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়॥
শুন শুন বাপ মন্ত্রি বলি তব কাছে।
তহশীলেতে মহেশ ঘোষ প্রাণে মারা গেছে॥

এখনি পেয়াদাগণ আসিবে এখানে ।
বল দেখি ও বাপ মন্ত্রি যাই কোন স্থানে ॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ না করিবেন ভয় ।
কিছু টাকা খরচ করিলে বড় ভাল হয় ॥
আসামীর কাছে যদি টাকা ওরা পায় ।
যুক্তি পরামর্শ কত ব'লে ক'রে দেয় ॥
মহারাজ বলে মন্ত্রি কত টাকা দিব
টাকা খরচ করিলে আমি পরিত্রাণ পাব ॥
মন্ত্রী বলে আটাশ টাকা দিতে আমায় হবে ।
দরওয়াজাতে যাব আমি নিশ্চয় জানিবে ॥
একথা শুনিয়া রাজা চাবি ফেলে দিল ।
সিন্দুক খুলিয়া মন্ত্রী আটাশ টাকা নিল ॥
আটাশ টাকা গণে মন্ত্রী হাতে করে নিল ।
মোবারক গাজীর কথা স্মরণ হইল ॥
গলায় বস্ত্র যোড়হস্তে সেলাম করিল ।
বাবাজী বলিয়া তখন ডাকিতে লাগিল ॥
বিপদ কালেতে বাবা করিবে উদ্ধার ।
তোমা বিনা উদ্ধারিতে কে আছে আমার ॥
তব নাম স্মরণ করে দরওয়াজাতে যাই ।
পেয়াদার হাতে যেন পরিত্রাণ পাই ॥
করিয়া গাজীর স্মরণ দ্বারেতে পৌঁছিল ।
জমাদারকে ডেকে তখন কহিতে লাগিল ॥
সাহস করিয়া মন্ত্রী এই কথা বলে ।
নবাবের জমাদার নহ কোন কালে ॥
একথা শুনিয়া রাগে কহে জমাদার ।
দেওয়ানের মত আজ করিব তোমার ॥
মন্ত্রী বলে তজ্‌বিচ্‌ কিছু নাহি জান ।
বিনা দোষে দেওয়ানজিকে খুন কর কেন ॥
জমাদার বলে আজ না পাই রোজ কড়ি ।
তিন মাস বাদে আসি মহারাজের বাড়ী ॥
মন্ত্রী বলে কেত্‌না কড়ি দিতে হবে বল ।
টাকার জন্ম একজনার প্রাণদণ্ড হল ॥
সিকা সিকা রোজ পাব বলে পিয়াদায় ।
দুই টাকা করে মন্ত্রী এক একজনে দেয় ॥
জমাদারে চাবি টাকা তখনই দিইল ।
একুনে আটাশ টাকা খরচ করিল ॥
টাকা পেয়ে জমাদার বড় খুসি হয় ।
মন্ত্রী বলে পেঁচাকুলে রাজা মহাশয় ॥
তিন দিবস বাদে এনে হাজির করিব ।
এখনি তাঁহার কাছে চিঠি পাঠাইব ॥
দশ দিন সময় দিলাম জমাদার বলে ।
চিঠি প্রেরণ করিবেন দক্ষিণ পেঁচাকুলে ॥
একথা শুনিয়া মন্ত্রী কহে জমাদারে ।
দেওয়ানজীকে লয়ে আমি যাব অন্তঃপুরে ॥
হাতে রশি দেওয়ানজীকে খুলে দিয়াছিল ।
মৃতভাবে দেওয়ানজী মাটিতে পড়িল ॥
রক্তের ঝারা বদন ভরা মহেশ ঘোষের গায় ।
আস্তে আস্তে মন্ত্রী তখন কোলে করে নেয় ॥
মহারাজের কাছে এসে হলো উপনীত ।
দেখে মহারাজ কান্দে হইয়া দুঃখিত ॥
উঠ উঠ মহেশ ঘোষ ওহে প্রাণের ভাই ।
হাস্যমুখে কহ কথা জীবন জুড়াই ॥
অজ্ঞান হইয়া আছে রাজার দেওয়ান ।
মহারাজ বলে বুঝি নাহি দেহে প্রাণ ॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয় ।
দেওয়ানজি মরেছে প্রাণে কি করি উপায় ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ বলি তব কাছে ।
মরেনি মরেনি বোধ হয় অজ্ঞান হয়েছে ॥
আদা ছেচে আদার জল মুখেতে দেইলে ।
জ্ঞানের উদয় হবে মন্ত্রী তখন বলে ॥
মহারাজ বলে মন্ত্রি দেরি না করিবে ।
এখনি আদার জল মুখেতে দেইবে ॥
আদা ছেচে আদার জল মুখে দিতে যায় ।
বাবাজী বাবাজী বলে ডাকে উভরায় ॥

দেওয়ানজী অজ্ঞান হয়ে আছে মার খেয়ে।
আদা ছেচে দিব বাবা তব নাম লয়ে॥
এখনি চৈতন্য হবে আপনার দয়ায়।
জাহিরের পীর তবে জানিব নিশ্চয়॥
সেলাম করেন মন্ত্রী গাজীর চরণে।
আদার জল দিতে গেল দেওয়ানজীর বদনে॥
অন্তর্য্যামী মোবারক অন্তরে জানিল।
গাজীর দোয়ায় তাহার চৈতন্য হইল॥
উঠিয়া দাঁড়ায় তখন রাজার সম্মুখে।
অবাক্ হইল রাজা দেওয়ানজীকে দেখে॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়।
এই মন্ত্র ও বাপ মন্ত্রী পাইলে কোথায়॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ শুন শুন ধাম।
মন্ত্র তন্ত্র নহে গাজী সাহেবের নাম॥
একথা শুনিয়া বলে রাজা মদনরায়।
কাহার নাম মোবারক গাজী কহ না আমায়॥
কোথায় তাহার বাড়ী কহ না আমারে।
একথা শুনিয়া মন্ত্রী কহে বিনয় ক'রে॥
মুসলমান হয় তিনি কুলের প্রধান।
ফকির হইয়া আছে ঘুটারিতে স্থান॥
একথা শুনিয়া কহে মন্ত্রীকে ডাকিয়া।
মা কালী শালগ্রাম যাইল হারিয়া॥

... ...

বিপদ উদ্ধার করবে ফকির আসিয়া॥
মন্ত্রী বলে শুন শুন রাজা মহাশয়।
মনের মানস করে যে যায় তথায়॥
তাহার মানস তিনি করেন পূরণ।
এমন ফকির কোথায় না দেখি কখন॥
তাঁর কাছে মহারাজ যাবেন আপনি।
আপনার সৎ উপায় করিবেন তিনি॥
একথা শুনিয়া কহে রাজা মদনরায়।
কি লইয়া যাব মন্ত্রি কহ না আমায়॥

মন্ত্রী বলে শুন শুন রাজা মহাশয়।
যার যেমন ক্ষমতা সে তাহাই লইয়া যায়॥
যে যাহা লয়ে যায় মন স্থির করে।
হাত থেকে লয়ে গাজী আশীর্ব্বাদ করে॥
দোমনা করিয়া যদি কেহ লয়ে যায়।
তার দিকে সেই ফকির ফিরে নাহি চায়॥
মহারাজ বলে মন্ত্রি যাব তাঁহার কাছে।
যা হবার তা হইবে ভাগ্যে যাহা আছে॥
যাও যাও অহে মন্ত্রি বাজার ভিতরে।
সওয়া পাঁচ সিকায় সিণি আন ত্বরা করে॥
টাকা লয়ে মন্ত্রী তখন বাজারেতে গেল।
ফুল সিণি গাজীর নামে খরিদ করিল॥
সিণির হাঁড়ি লয়ে মন্ত্রী হইল বিদায়।
উপনীত হইল যেথা রাজা মদনরায়॥
খিড়কির দ্বারে বেহারা করে পালকির সাজন।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিলেন গমন॥
হাজার হাজার সেলাম করেন বাবার পায়।
গাজীকে করিয়া স্মরণ হইলেন বিদায়॥
রাজপুত্র নিজনাটী পশ্চাৎ করিয়া।
সোনারপুর গ্রাম রাজা উত্তরিল গিয়া॥
সোনারপুর হতে রাজা হলেন বিদায়।
নওয়া-ভাসানের ঘাটে এসে উপনীত হয়॥
নওয়া-ভাসানের ঘাট রাজা পার হয়ে ছিল।
গৌড়দহ কাছারি রাজা উপনীত হল॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজা এই কথা কয়।
কতদূর যেতে হবে কহ না আমায়॥
রাজাকে যাইয়া মন্ত্রী এই কথা কয়।
বনমধ্যে নিশান দেখিতে পাওয়া যায়॥
ঐ নিশানের কাছে মোকাম তাঁহার।
রাজা বলে যেতে হবে বনের মাঝার॥
বনের মধ্যে বাঘ আছে মনে শঙ্কা হয়।
কেমনেতে যাব মন্ত্রি কহ না আমায়॥

একথা শুনিয়া মন্ত্রী কহেন রাজারে।
বাবাজীর দোহাই দিলে বাঘ যায় দূরে॥
পাল্‌কী চড়ে তার কাছে যেতে না পারিবে।
কাঙ্গাল ফকির বটে দেখা না করিবে॥
পাল্‌কী চড়ে অহঙ্কারে যেই জন যায়।
তার সঙ্গে সেই ফকির দেখা নাহি দেয়॥
সির্ণির হাঁড়ি আপনার নিতে হবে মাথে।
দেখা করিবেন যদি বাবাজীর সাথে॥
সেলাম করিয়া তখন বাবাজীর পায়।
সির্ণির হাঁড়ী মহারাজ লইলেন মাথায়॥
বাবাজীর স্মরণ করি গমন করিল।
অন্তর্য্যামী গাজী সাহেব অন্তরে জানিল॥
অন্তর্য্যামী গাজী সাহেব জানিল অন্তরে।
আপন পুত্র দুখীকে ডাকে বারে বারে॥
আমার কাছে আসিতেছে রাজা মদনরায়।
কাল্ যার কথা দুখী বলিলাম তোমায়॥
ছেড়া গুণের চট তাতে ধুলা মেশাইয়া।
মুরশিদের নাম ক'রে দিল গায় তুলিয়া॥
ছেড়া গুণের চট্ যখন অঙ্গে দিয়াছিল।
পঞ্চম বৎসরের বালক ঐখানেতে হলো॥
পথে বসে ধুলা-বালি তুলে দিচ্ছেন গায়।
সেই স্থানেতে চলে এলেন রাজা মদনরায়॥
মুরশীদের মোকাম গাজীর দেখিল নজরে।
গলায় বসন দিয়া ছালাম তাতে করে॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজা এই কথা কয়।
বাবাজী কোথায় আছেন কহিবেন আমায়॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ শুন দয়াময়।
পথের মধ্যে ধুলা বালি তুলে দেয় গায়॥
জট মাথে গুণের চট্ গায়েতে দিয়াছে।
পঞ্চম বৎসরের বালক হইয়া রহেছে॥
ঐ হবেন বাবাজী জানিলাম নিশ্চয়।
সেলাম করুন এসে বাবাজীর পায়॥

এ কথা শুনিয়া রাজা কহেন মন্ত্রীকে।
পাগলের মত মন্ত্রি জানিলে আমাকে॥
তোমার কথায় পাগল হয়ে আইলাম এখানে।
পঞ্চম বৎসরের ছেলে দেখিলাম নয়নে॥
কাঙ্গালেরা এই ছেলে ফেলিয়া গিয়াছে।
সির্ণি খাবার লোভে ঐ ছেলে ব'সে আছে॥
না হইবে পীর আমি জানিলাম মনে।
বোধ হয় বাবাজী তিনি গিয়াছেন কোন স্থানে॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ বলি তব কাছে।
মন বুঝিবার তরে বসিয়া রহেছে॥
দিনের মধ্যে হতে পারেন অনেক প্রকার।
কখন ফকির কভু বালক আকার॥
কখন পাগল হয়ে ফেরে বনে বনে।
নানা প্রকার হতে পারে যাহা লয় মনে॥
গলায় বসন দিয়া চরণ ধরিবে।
কাঙ্গালের ছেলে বলে ঘৃণা না করিবে॥
এ কথা শুনিয়া রাজা চারি দিকে চায়।
কিরূপ ধরিব মন্ত্রি কহ না আমায়॥
দুগ্ধ যেমন সাদা এরূপ করিবে মন।
ভক্তিভাবে ধরিবেন বাবাজীর চরণ॥
একথা শুনিয়া রাজা গলে বসন দিয়া।
কাঁদিতে লাগিল রাজা চরণে পড়িয়া॥
বিপদে পড়েছি দেহ চরণ দুখানি।
আপনার চরণ বিনা কিছু নাহি জানি॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা এই কথা কয়।
নিজ মূর্ত্তি ধরে গাজি উঠিয়া দাঁড়ায়॥
মস্তকেতে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।
মোকদ্দমায় সদুপায় দিব আমি করে॥
কেঁদ না কেঁদ না' বাবা ধরিয়া চরণ।
বিপদ উদ্ধার তব করিব এখন॥
মদনরায় বলে আমি ধর্ম্ম প্রমাণ কব।
পদধূলি দিবে আমি মস্তকে লইব॥

পদধূলি লয়ে গাজী দিলেন তার হাতে।
ভক্তিভাবে পদধূলি লইলেন মাথে॥
গাজী বলে মদনরায় শুন মন দিয়া।
মাটি কাট খানিক আমার পুকুরে যাইয়া॥
কোড়াদার সঙ্গে তোমার মাটি কাট্‌তে হবে।
গরীব ফকীরের কথা রদ না করিবে॥
একথা শুনিয়া রাজা কাটিতে যায় মাটি।
কোমরেতে বাঁধিলেন জামার দামনপাটি॥
কোদালীর হাত থেকে কোদাল লইল।
মাটি কাট্‌তে মদনরায় পুকুরে নাবিল॥
এক কোপ দুই কোপ তিন কোপের কালে।
গাজীর দয়ায় তার কাপড় গেল খুলে॥
কোদাল রেখে মদনরায় কাপড় পর্‌ছেছিল।
মদনরায়কে ডেকে গাজী কহিতে লাগিল॥
তিন কোপ মাটি কাট্‌লে রাজা মদনরায়।
তিন পুরুষ জমিদারী রহিবে নিশ্চয়॥
একথা শুনিয়া রাজা অবাক্ হইল।
সদয় হইয়া বাবা কেন বাম হল॥
গাজী বলে মদনরায় কোমরে হাত দিলে।
মাটি কাট্‌তে পুকুরেতে কাতর হইলে॥
তিন কোপ মাটি কেটে কোমরে দিলে হাত।
তিন পুরুষ জমিদারী রহিবে নেহাত॥
একথা শুনিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল।
মাপ কর বাবাজী গো অপরাধ হলো॥
উপরি উপর একশত কোপ মাটি কাট্‌ব আমি।
সদয় হইয়া বাবা দয়া কর্‌বে তুমি॥
গাজী বলে মদনরায় বলি তব ঠাঁই।
যে বাক্য বলেছি আমি রদ হবে নাই॥
মদনরায় চৌধুরী বলে শুন বাবাজী।
তিন পুরুষ গত হলে উপায় হবে কি॥
কে রক্ষা করিবে আমার তালুক মুল্লুক।
কি দোষেতে মম প্রতি হইলে বৈমুখ॥
গাজী বলে মদনরায় আমার বাক্য লবে।
পোষ্য পুত্র রাখ্‌লে তোমার তালুক রক্ষা হবে॥
যতদিন নাম মম রবে মেদনমল্লে।
ততদিন দুঃখ নাহি পাবে কোনকালে॥
ভক্তিভাবে যেই জন আমাকে ডাকিবে।
কেনা হয়ে রব তার নিশ্চয় জানিবে॥
কোনরূপে দুঃখ আমি নাহি দিব তারে।
যে জন ভুলিবে মোরে দুঃখ দিব তারে॥
একথা শুনিয়া তখন রাজা মদনরায়।
চরণ ধরিয়া তবে এই কথা কয়॥
বার জন সেফাই আর এক জমাদার।
বসিয়া রয়েছে তারা দেহুরিতে আমার॥
দেখা পাইলে আমার হাতে রশি দিবে।
বন্ধন করিয়া আমায় লইয়া যাইবে॥
একথা শুনিয়া গাজী কহেন তাহারে।
আশীর্ব্বাদ যাদুমণি করিলাম তোরে॥
শমনের ভয় আদি নাহিক রহিবে।
দরওয়াজাতে যাবা মাত্র সেলাম করিবে॥
তোমার সঙ্গেতে যাবে চাকর হইয়া।
মোকদ্দমা ফতে হবে ঢাকাতে যাইয়া॥
মদনরায় বলে দেখি ঐ রাঙ্গা চরণ।
যাত্রা মঙ্গল শুভদিন করিবে এখন॥
একথা শুনিয়া গাজী কহেন রাজারে।
দিন স্থির হল তোমার রোজ মঙ্গলবারে॥
মঙ্গলবারে যাত্রা কর্‌বে পথে কর্‌বে স্থিতি।
উদ্ধার করিয়া লব শুক্রবার রাতি॥
একথা শুনিয়া রাজা সেলাম করে পায়।
কান্দিতে কান্দিতে তখন এই কথা কয়॥
মোকদ্দমা ক'রে দেন বড় করেন হিত।
মসজিদ্ মোকামে দিব সোনা রূপার চিত॥
সাত থালী দিয়ে তব নামে হাজত দিব।
গান্ বাইন্ ডেকে তব গান করাইব॥৬

মোবারক বলে বাবা আমার বাক্য লবে।
তোমা হতে নাম মম জাহির হইবে ॥
শুন শুন যাদুমণি মম বাক্য লও।
মোকদ্দমা হয়ে গেল গৃহে চলে যাও ॥
মুর্শিদের নামে শির্ণি হাজত পড়িয়া।
মদনরায়ের হস্তে দিল প্রসাদী বলিয়া ॥
সির্ণির হাড়ী মদনরায় মাথায় লইল।
সেলাম করিয়া তবে বিদায় হইল ॥
ঘুটাবি সেবিফ হতে হলেন বিদায়।
গৌড়দহ কাছাবিতে উপনীত হয় ॥
গাজীব স্মরণ রাজা মনেতে করিয়া।
বিদায় হইলেন রাজা পাল্‌কিতে বসিয়া ॥
বেহারা লইয়া পাল্‌কি দ্রুতবেগে যায়।
নিমতলাঘাটে এসে উপনীত হয় ॥
নিমতলাব ঘাট রাজা পার হয়েছিল।
পুঁড়ী বেগমপুর রাজা মদনরায় এলো ॥
পুঁড়ী বেগমপুর থেকে হলেন বিদায়।
রাজপুব নিজ বাটী উপনীত হয় ॥
পাল্‌কি চড়ে দরওয়াজাতে উপনীত হল।
দেহুরীতে জমাদার বসে দেখিতে পাইল ॥
রাগের বশেতে ডাকে যত পেয়াদায়।
পাল্‌কি চড়ে আসিতেছে রাজা মদনরায় ॥
এত্তা বড় জমিদার এত্তা জোর ধরে।
পাল্‌কি চড়ে চোর বেটা তালুকেতে ফেরে ॥
জমাদার হুকুম দিয়েছে গোস্বায় জ্বলিয়া।
হাতে রশি দিয়া দঢ় বন্ধন করিয়া ॥
একথা শুনিয়া যত পেয়াদা উঠিল।
পঞ্চ হাতিয়ার সবে হাতেতে লইল ॥
দেখে রাজা মদনরায় কাঁপেন থরে থরে।
কি করি উপায় মন্ত্রী কহ না আমারে ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ শুন গুণধাম।
উপায় নিরুপায় সেই বাবাজীর নাম ॥

একথা শুনিয়া রাজা পাল্কিতে ঠোকে মাথা।
বিপদ্‌কালে বাবাজী গো রহিলেন কোথা ॥
বাবাজী বলে কান্দে রাজা মদনরায়।
বিপদকালেতে বাবা বাখ রাজা পায় ॥
অন্তর্যামী মোবারক অন্তরে জানিল।
সোনাব ভ্রমর হয়ে এসে দেখা দিল ॥
কেঁদ না কেঁদ না বাবা কেঁদ নাকো তুমি।
উদ্ধার করিতে তব আসিয়াছি আমি ॥
এ কথা শুনিয়া কহে রাজা মদনরায়।
দেখা দিবেন এসে আমায় হইয়া সদয় ॥
গাজী বলে মদনবায় আমার কথা বাখ।
আমায় দেখ্‌বে যদি দুটী হস্ত পেতে থাক ॥
ভক্তিভাবে মদনবায় হস্ত পেতে ছিল।
সোনাব ভ্রমব হয়ে বাজার হস্তেতে বসিল ॥
গুণ গুণ স্বরে গাজী এই কথা কয়।
কি কারণে ডাক বাবাজী মদনরায় ॥
মদনবায় বলে তখন শুন বাবাজী।
বান্ধিবে পেয়াদাগণে উপায় হবে কি ॥
গাজী বলে মদনবায় ভয় না কবিবে।
তোমার কাছেতে ওরা নাহিক যাইবে ॥
এ কথা বলিয়া গাজী অন্তর্ধ্যান হল।
পাল্‌কি চড়ে মদনরায় দরওয়াজাতে গেল ॥
অজ্ঞান হয়ে সেফাইগণ দাঁড়াইয়া রয়।
যার যে হাতিয়াব সকল মাটিতে পড়ে রয় ॥
যোড় হস্তে জমাদার সম্মুখেতে এল।
বিনয় করিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥
কোথা হতে এলে কিবা তব নাম।
পরিচয় দেহ আজি ওহে গুণধাম ॥
আপনার নাম রাজা পরিচয় দিল।
গাজীর চরণে তখন সেলাম করিল ॥
পাল্‌কী চড়ে মহারাজ অন্তঃপুরে যায়।
কয় জন সেফাই তারা অজ্ঞান হয়ে রয় ॥

জমাদার ডাকে তারা উত্তর নাহি দিল।
দেখে মন্ত্রী ফরিদ নস্কর রাজার কাছে গেল॥
বার জন সেফাই বুঝি প্রাণে মারা যায়।
... ...
বাবাজীর দোয়ায় তাদের জ্ঞান গেছে হরে।
বিপদ ঘটিল বুঝি দরওয়াজা উপরে॥
একথা শুনিয়া রাজার প্রাণে হল ভয়।
দরওয়াজাতে গেলেন তখন রাজা মদনরায়॥
বিনয় করিয়া তখন কহিতে লাগিল।
গরীবের দ্বারে কেন কষ্ট লহ বল॥
গাজীর দোয়ায় তখন জ্ঞানোদয় হল।
মহারাজ বলে সবে সেলাম করিল॥
সবে মিলে কহে কথা রাজার সঙ্গেতে।
কাছারিতে যারা মাত্র কার্য্য হবে ফতে॥
ধীরে ধীরে মহারাজ অন্তঃপুরে যায়।
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়॥
যাহা করেন গাজী সাহেব যাহা করেন সাঁই।
নাগরা নিশান করে চল দরবারেতে যাই॥
একথা শুনিয়া মন্ত্রী হরষিত হ'ল।
নাগরা নিশান করে তখনি আইল॥
পাল্কী চড়ে মহারাজ করিল গমন।
গাজী সাহেবের নাম করিয়া স্মরণ॥
রাজপুর নিজ বাটী পশ্চাৎ করিল।
সোনারপুর গ্রাম রাজা গিয়া উত্তরিল॥
সোনারপুর হতে রাজা হলেন বিদায়।
টালিগঞ্জে গিয়া তখন উপনীত হয়॥
গগনমণ্ডলে বেলা ছয় দণ্ড ছিল।
রাজার কাছে গিয়া মন্ত্রী কহিতে লাগিল॥
বারবেলা হয়েছে আজি কোথায় নাহি যাব।
গাজীর স্মরণ করে তাঁবু ফেলে রব॥
সেলাম করেন রাজা বাবাজীর পায়।
টালিগঞ্জে মহারাজা তাঁবু ফেলে রয়॥

সে রাত প্রভাত হল বড়ই সকালে।
গা তুল গা তুল রাজা এই কথা বলে॥
মহারাজ বলে মন্ত্রী বলি তব ঠাঁই।
এখন যাইতে হবে নিশি আর নাই॥
পাল্কী চড়ে মহারাজ করিল গমন।
গাজী সাহেবের নাম করিয়া স্মরণ॥
টালিগঞ্জ থেকে রাজা হলেন বিদায়।
কালীঘাটে গিয়া তখন উপনীত হয়॥
কালীঘাট মহামায়ী বাঁয়েতে রাখিয়া।
কলিকাতা মহারাজ পৌছিল যাইয়া॥
কলিকাতা মহারাজ পশ্চাৎ করিল।
বরানগর চিৎপুর উপনীত হল॥
বরানগর চিৎপুর পার হয়ে যায়।
ফরাসডাঙ্গাতে গিয়া উপনীত হয়॥
ফরাসডাঙ্গা মহারাজ পশ্চাৎ করিল।
আনওয়ারপুরে গিয়া তখন উপনীত হল॥
এইরূপে তিন মাস পথে চলে যায়।
ঢাকার সহরে গিয়া উপনীত হয়॥
গগনমণ্ডলে বেলা ছয় দণ্ড রয়।
রাজার কাছে গিয়া মন্ত্রী এই কথা কয়॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ আমার কথা রাখ।
নবাবের কাছারি ঘর পাল্কি থেকে দেখ॥
একথা শুনিয়া রাজা পাল্কি বসে দেখে।
নবাবের কাছারি দেখে কথা নাহি মুখে॥
কেমনেতে যাব মন্ত্রি কহ না আমায়।
তিন মাস হল বাবা নাহি দেখা দেয়॥
একাক্রমে তিন মাস আইলাম চলে।
অধমের কথা তিনি গিয়াছেন ভুলে॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ যদি বিপদ হয়।
গাজীর স্মরণ করিলে উদ্ধারিয়া নিব॥
আপদ্ বিপদ্ পথে কিছু নাহি হল।
কি কারণে বাবাজী দেখা দেবেন বল॥

মহারাজ বলে মন্ত্রি বলি তব ঠাই।
চল চল কাছারিতে সবে মোরা যাই॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ কাছারিতে না যাব।
বাবাজীর স্মরণ করে তাঁবু ফেলে রব॥
মোকদ্দমা রুজু হবে যাইয়া প্রভাতে।
আজ গেলে না দেখা হবে হাকিমের সাথে॥
বারবেলা হয়েছে আজ না যাব কোথায়।
এই স্থানে রব আমি রাজা মহাশয়॥
ছয় দণ্ডের পথে রাজা তাঁবু ফেলে রয়।
না জানি কাল প্রভাতে ভাগ্যে কিবা হয়॥
রজনীতে শুয়ে আছে নিদ্রা নাহি চোকে।
বিপদ্‌কালে বাবা আসি উদ্ধার আমাকে॥
বলিতে কহিতে নিশি দুই প্রহর হল।
দুখি দুখি ব'লে গাজী ডাকিতে লাগিল॥
কুশা ঘাস ও বাপ দুখি এনে আমায় দিবে।
ঢাকার সহরে যাব নিশ্চয় জানিবে॥
ছয় দণ্ডের পথে আছে রাজা মদনরায়।
কুশা ঘাস এনে দুখি দেহ না ত্বরায়॥
কুশাঘাস এনে তখন বাবাজীকে দিল।
মুর্শিদ বলিয়া গাজী ডাকিতে লাগিল॥
উত্তর শিহর করে বেবেথা রাখিল।
সোনার ভ্রমর হয়ে উড়িয়া চলিল॥
শুয়ে ছিল নবাব সেথা নিশি ভোগ রাতে।
চলিলেন গাজী মিয়া জোওয়াব দেখাতে॥
ঢাকার সহরে গেল আঁখির পলকে।
নিদ্রাগত ছিল নবাব বাতি জেলে রেখে॥
চতুর্দ্দিকে বাতি জ্বলে নবাব মধ্যে রয়।
ধীরে ধীরে মোবারক গৃহমধ্যে যায়॥
যাইয়া নবাবের তখন শিহরে বসিল।
জ্বলিতে ছিল মোমের বাতি মলিন হইল॥
আপনার রূপে ঘর আল ক'রে রয়।
নবাবকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়॥

উঠ উঠ নবাব আউলে হওরে চিতন।
শিহরে মোবারক গাজী ঘুমে এত মন॥
আল্লা মোরে করিয়াছেন জাহিরের পীর।
মায়াজালে রহিলাম বন্দী না হল জাহির॥
আমার নাম মোবারক গাজী নেওরে পরিচয়।
কাল প্রভাতে আসবে হেতা রাজা মদনরায়॥
সাল শিরপা পাল্কি দিয়া তারে উলাইবে।
চড়নের ঘোড়া তোমার বক্সিস্ করিবে॥
আর এক বাত নবাব শুন হকিকত।
পরওয়ানা লিখিয়া দিবে বেসরিকত॥
খেতাবি করিবে বিদায় মদনরায়ের তরে।
আমার মোকাম হবে ঘুটারি মাঝারে॥
এই কয় কথা তোর মনে নাইক ভায়।
সবংশে পাইবে দুঃখ কাঙ্গাল কথায়॥
একথা শুনিয়া নবাব উঠে চমকিয়া।
কহিতে লাগিল কথা কান্দিয়া কান্দিয়া॥
নবাব বলে বাবাজী আমার পানে চাও।
কে তুমি কহিলে দয়া পরিচয় দেও॥
গরীবের প্রতি বাবা নিদয় না হবে।
আস্‌রা মাত্র বিদায় কর্‌ব নিশ্চয় জানিবে॥
বলিতে কহিতে গাজী অন্তর্দ্ধান হল।
নিশিতে নবাব তখন কান্দিতে লাগিল॥
সোনার ভ্রমর হয়ে গাজী হলেন বিদায়।
উপনীত হল গিয়া দপ্তরখানায়॥
তেতোর তালা সেই দরওয়াজাতে ছিল।
মুর্শিদের বলে সেই দরওয়াজা খুলিল॥
মুর্শিদ বলিয়া গাজী গৃহ মধ্যে যায়।
মদনরায়ের বাকির কাগজ খুঁজিয়া বেড়ায়॥
মদনরায়ের নাম সেই দপ্তরেতে ছিল।
যাইয়া তখনি সেই দপ্তর খুলিল॥
কাগজ দেখেন গাজী নিরখিয়া আঁখি।
তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা মদনরায়ের বাকি॥

কাগজ দেখিয়া গাজী অবাক্ হইল।
এত টাকা মদনরায়ের বাকি পড়ে ছিল॥
ডাহিনের বাকী লয়ে বামে ফেলে দেয়।
কাগজ সাধিয়া রেখে হলেন বিদায়॥
ঘুটারিতে এসে গাজী উপনীত হল।
দুখি দুখি বলে তখন ডাকিতে লাগিল॥
গাজী বলেন ও বাপ দুখি শুন মোর বাণী।
ধড়েতে প্রবেশ হই দেহ ওজুর পানি॥
ওজুর পানি দুখি এনে বাবাজীকে দিল।
ওজু করে মোবারক ধড়ে প্রবেশিল॥
বলিতে কহিতে নিশি যায় পোহাইয়া।
বাবাজীর কাছে দুখী কহেন যাইয়া॥
কিরূপেতে মোকদ্দমা হইল বাজার।
বল বল বাবাজী গো সঙ্গেতে আমার॥
এ কথা শুনিয়া গাজী কহেন দুখীরে।
সোনার ভ্রমর হয়ে যাই ঢাকার সহরে॥
রাজা মদনরায় আছে ছয় দণ্ডের পথে।
নিশীথে যাইয়া তাহার দরবার করি ফতে॥
এই কথা দুই জনে কহিতে লাগিল।
শয্যা হইতে নবাব গা তুলে বসিল॥
ফজরের নমাজ তখন করিল আদায়।
প্রভাতে আসিয়া নবাব তক্তে বার দেয়॥
নাজীর হইল হাজীর আবকান দৌলত।
কান্দিতে কান্দিতে নবাব কহেন এই বাত॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে সকলের কাছে।
স্বপনেতে গাজী মিয়া যাহা বলে গেছে॥
রাত্রিকালে শুয়ে আমি পালঙ্ক উপরে।
মোবারক বলিয়া পীর বসিল শিহরে॥
স্বপনেতে এই কথা বলিল আমায়।
কাল প্রভাতে আস্‌বে হেতা রাজা মদনরায়॥
সাল শিরপা পাক্ষি তারে বক্সিস্ করিবে।
চড়নের ঘোড়া দিয়া আগ্ বাড়ায়ে লবে॥
এই কথা স্বপনেতে বলিছেন তিনি।
নয় লক্ষ সেফাই লয়ে যাইব এখনি॥
শুনিলাম রাজা আছে ছয় দণ্ডের পথে।
সেফাই লইয়া যাইব আগ্ বাড়াইতে॥
শুনিয়া সেরেস্তাদার যোড় হস্তে কয়।
সেফাই লইয়া যাওয়া উচিত না হয়॥
যাইতে রাস্তার ফৌজ নাহিক ধরিবে।
ফৌজ দেখে মদনরায় ত্রাসযুক্ত হবে॥
প্রাণের ভয়ে বিষ পানে ত্যজিবে জীবন।
বিপদ্ ঘটিবে তবে জানিবে এখন॥
সম্প্রতি পঞ্চাশ সেফাই দেহ পাঠাইয়া।
আনিবে মদনরায়ে আগ বাড়াইয়া॥
পঞ্চাশ সেফাই নবাব দিল পাঠাইয়া।
আন সেই মদনরায়ে আগ্ বাড়াইয়া॥
পঞ্চাশ সেফাই তবে করিল সাজন।
পঞ্চ হাতিয়ার লয়ে করিল গমন॥
তাঁবুর ভিতরে বসে দেখে মদনরায়।
নিকটে পৌঁছিল এসে যত পেয়াদায়॥
মদনরায় বলে মন্ত্রী সর্ব্বনাশ হল।
কাল গেলে ভাল ছিল তলব চিঠি এল॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ না করিবেন ভয়।
বাবাজীর নাম যেন হৃদে গাঁথা রয়॥
বাবাজী বাবাজী ব'লে ডাকেন তখন।
বিপদ্ সময় বাবা দিবেন চরণ॥
একে একে পেয়াদা সম্মুখে দাঁড়ায়।
দেখে ভয়ে কম্পমান রাজা মদনরায়॥
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া রাজা কহেন খানসামায়।
জলের পিপাসায় মম প্রাণ বুঝি যায়॥
দেখে দুই জমাদার সম্মুখে দাঁড়াইল।
গলে বস্ত্র দিয়া কথা কহিতে লাগিল॥
মোবারক গাজী তোমার হইল সদয়।
আজ নিশিকালে তিনি স্বপ্নে বলে যায়॥

বলিয়া গেলেন তিনি আপনার কথা।
সেই জন্য আগ্‌বাড়াইতে আইলাম হেতা ॥
এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী রাজার কাছে গেল।
মহারাজার কাছে তখন কহিতে লাগিল ॥
এত সমন নয় সমন নয় আমি জানিলাম নিশ্চয়।
আমাদের আগে আগে বাবাজী এসে
দরবার করে যায় ॥
শুন শুন মহারাজ বলি তব ঠাই।
কাছারিতে যাব মোরা বিলম্বে কাজ নাই ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা পাল্কিতে বসিল।
বেহারা লইয়া পাল্কি কাছারিতে এল ॥
তক্তে বসে নবাব আউলে'দেখিবার পায়।
শাল সিরপা পাল্কী দিয়া আগবাড়াইয়া লয় ॥
যেমন মত গাজী সাহেব বলে এসেছিল।
সেইরূপেতে মহারাজা আগবাড়াইয়া'নিল ॥
নবাব বলে মদনরায় এই স্থানে এস।
আমি বসিতাম তক্তের উপর তুমি এসে বস ॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ না করিবেন ভয়।
বাবাজীর নাম যেন হৃদে গাঁথা রয় ॥
সেলাম করিল রাজা মোবারকের পায়।
তক্তের উপর বসিলেন রাজা মদনরায় ॥
নবাব বলে মদনরায় হুকুম কর্‌বে তুমি।
তুমি বস্‌বে ডাহিন দিকে বামে বস্‌ব আমি ॥
বসিতে হুকুম দিল রাজা মদনরায়।
ছোট হয়ে নবাব রাজার বামে ব'সে রয় ॥
ত্রাসে ঘাম হয়েছে মদনরায়ের গায়।
তখন একটী শ্বেত চামর ঢোলাইয়া লয় ॥
আপনি বাতাস দিলে মদনরায়ের গায়।
বাতাস খাইয়া রাজার প্রাণ শীতল হয় ॥
নবাব বলে দপ্তরি আমার কথা শুন।
মদনরায়কে বিদায় করব দপ্তর গিয়া আন ॥

তারাতারি দপ্তরি গিয়া দপ্তর আনিল।
আপনি পরওয়ানা লিখে নাম সহি করিল ॥
নবাব বলে মদনরায় বড় বাপের বেটা।
আমার হাতের পেলি রে বাবা
বেশরিকতের পাট্টা ॥
এই কথা বলে সেই বাবাজীর কাছে।
লক্ষ লক্ষ সেলাম নবাব পাঠাইয়া দেছে ॥
রাজা হাজার সেলাম করে বাবাজীর পায়।
দরবার ক'রে বিদায় হলেন রাজা মদনরায় ॥
জেলখানার নিকট দিয়া বাড়ীতে যেতেছিল।
কয়েদী আসামী সবে দেখিতে পাইল ॥
কেহ বলে চলে গেল রাজা মদনরায়।
ভাবিত হলেন সবে কি করে উপায় ॥
সবে মিলে যুক্তি করে দারগাকে কয়।
নগদ হাজার টাকা দিব আজ তোমায় ॥
মহারাজ মদনরায় যাবেন বাড়ীতে।
সাক্ষাৎ করিব গিয়া রাজার সাক্ষাতে ॥
টাকার লোভে দারগা সহায় করে নিল।
মদনরায়ের কাছে এসে উপনীত হল ॥
চরণ ধরিয়া সবে এই কথা কয়।
আমাদের ফেলে আজি যাইবে কোথায় ॥
আপনার সাহায্য বিনা অন্য গতি নাই।
যদি যাহ ফেলে তবে গাজীর দোহাই ॥
গাজীর দোহাই দিয়া চরণ ধরিল।
দেখে রাজা মদনরায় ভাবিত হইল ॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়।
বাবাজীর দোহাই দিল কি করি উপায় ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ এক মরণে মরি।
বাবাজীর নাম ক'রে চল নবাবের কাছারি ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা পাল্কি ফিরাইল।
পুনশ্চ নবাবের কাছে উপনীত হল ॥

খানসামা নবাবের গাত্রে তইল দিতেছিল।
পাল্কি চ'ড়ে মদনরায় সেই স্থানেতে এল ॥
নবাব বলে মদনরায় বলি তব ঠাই।
আমার সম্মুখে এলে তোমার গাজীর দোহাই॥
গাজীর দোহাই যখন মদনরায়কে দিল।
যেতেছিল বেহারাগণ থম্‌কে দাঁড়াইল ॥
ভাবিত হইয়া রাজা পাল্কিতে বসে রয়।
দেখিয়া নবাব তখন জিজ্ঞাসিল তায় ॥
শুন শুন মদনরায় বলি তব ঠাই।
ঐ স্থান হতে বল্‌বে কথা রদ্ কর্‌ব নাই ॥
ভাবিত হইয়া রাজা কহে মদনরায়।
বারভূঞা জমিদার ধরেছে আমায় ॥
নবাব আউলে ডেকে বলে শুন বাবাজী।
কয়েদী আসামীর উপায় তুমি কর্‌বে কি ॥
মদনরায় বলে আমি ধর্ম্ম প্রমাণ কব।
বারভূঞা জমিদারে জামিন হয়ে লব ॥
একথা শুনিয়া নবাব করে হায় হায়।
স্বহস্তে কাটগে বেড়ী রাজা মদনরায় ॥
তোমার কথা রদ আমি নাহিক করিব।
কয়েদে আসামী সবে ছাড়িয়া যে দিব ॥
বেড়ী কাট্‌তে মদন রায় জেলখানাতে গেল।
ঘুটারি সেরিফে গাজী অন্তরে জানিল ॥
দুখি দুখি বলে গাজী ডাকে উভরায়।
জেলের ভিতরে আজি গেল মদনরায় ॥
দুখী বলে বাবাজী এ কেমন কথা শুনি।
মোকদ্দমা করে এলে যাইয়া আপনি ॥
তবে কেন মদন রায় জেলের ভিতর গেল।
আপনার কথা বাবা ঠিক না হইল ॥
মোবারক বলে দুখি শুন বাবাজী।
অদৃষ্টে লিখন তাহার আমি কর্‌ব কি ॥
ভাগ্যে তাহার লেখা আছে জেলে যেতে হবে।
আড়াই ঘণ্টা মদনরায় জেলখানাতে রবে ॥
মোবারক গাজীর কথা বদ নাহি হল।
বেড়ী কাট্‌তে মদনরায়ের আড়াই ঘণ্টা হল ॥
একে একে বাহির করে যত জমিদারে।
শেষ কালে মদনরায় আইল বাহিরে ॥
জমিদারে হাজতের টাকা চাঁদা তুলে দেয়।
এক হাজার টাকা তখন হাজতের হয় ॥
গাজীর স্মরণ করে যে যার বাটীতে যায়।
পাল্কি চড়ে হলেন বিদায় রাজা মদনরায় ॥
ঢাকা থেকে রাজমিস্ত্রি সঙ্গে করে নিল।
গাজীর স্মরণ করে পথেতে চলিল ॥
একাক্রমে দুই সপ্তা এল পথে চলে।
কলিকাতায় এসে রাজা এই কথা বলে ॥
মদনরায় বলে মন্ত্রি এ কেমন হল।
দুই সপ্তায় কলিকাতায় কিরূপে আসি বল ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ গাজীর কৃপায়।
কলিকাতায় আইলাম জানিবে নিশ্চয় ॥
মদনরায় বলে মন্ত্রি লহ মিঠাই কিনে।
বাবাজীর হাজত দিব যাইয়া এক্ষণে ॥
এক হাজার টাকা যাহা কয়েদীরা দেয়।
সেই টাকা মিঠাই খরিদ করে মদনরায় ॥
এক শত এক ভার তখন সাজন করিল।
এক শত এক ভার মুটে স্কন্ধে করে নিল ॥
ধীরে ধীরে সবে মিলে ভার লয়ে যায়।
পিছে পিছে আসে তখন রাজা মদনরায় ॥
কলিকাতা হতে রাজা বিদায় হইল।
টালিগঞ্জে এসে তখন উপনীত হল ॥
টালিগঞ্জ হতে রাজা হলেন বিদায়।
সোনারপুরে এসে রাজা উপনীত হয় ॥
মদনরায় বলে মন্ত্রি গৃহে নাহি যাব।
বাবাজীর চরণ আগে দর্শন করিব ॥
একথা বলিয়া রাজা হলেন বিদায়।
আড়া-পাঁচে এলেন তখন রাজা মদনরায় ॥

আড়া-পাঁচ মদনরায় পশ্চাৎ করিল।
নওয়া ভাসানের ঘাটে এসে উপনীত হল॥
নওয়া-ভাসানের ঘাটে রাজা পার হয়ে যায়।
গৌড়দহ কাছারিতে উপনীত হয়॥
মদনরায় বলে মন্ত্রি আমার কথা শুন।
শীঘ্র ক'রে সাত খাসী সঙ্গে ক'রে আন॥
খাসী কিনে মন্ত্রী তখন রাজার কাছে আনে।
উপনীত হল আসি গাজীর সদনে॥
গলে বস্ত্র সেলাম করে গাজী মিয়ার পায়।
গাজী বলে পরম সুখে থাক মদনরায়॥
কিরূপে করিলে দরবার বল দেখি শুনি।
মদনরায় বলে বাবা আমি নাহি জানি॥
আপনি করেছ গিয়া আপন দরবার।
উপলক্ষ মাত্র কেবল পাঠালে আমায়॥
গাজী বলে মদনরায় বলি তব কাছে।
পথ পানে চেয়ে তোমার মা জননী আছে॥
মদনরায় বলে বাবা কেমন কথা বল।
তুমি না সদয় হলে মা কোথায় ছিল॥
তোমার হাজত নাহি দিলে গৃহে না যাইব।
মস্‌জিদের পত্তন তবে এখনি করিব॥
মস্‌জিদের স্থান গাজী দেখাইয়া দেয়।
এই স্থানে মস্‌জিদ হবে শুন মদনরায়॥
মদনরায় বলে বাবা তোমার হাজত দিয়া।
হাজত হইলে যাব গৃহেতে চলিয়া॥
মোবারক বলে দুখী নাহি কর দেরী।
এখনই সাত খাসী দেহ জবাই করি॥
সাত খাসী দুখী দেওয়ান জবাই ক'রে দেয়।
সাত হাঁড়ী মাংস তখন সাত খাসীতে হয়॥
সাতটী তিউড়ী কয়ে ভাবিয়া খোদায়।
সাত হাঁড়ী মাংস তখন বসাইয়া দেয়॥
আড়াই হালা কাঁচা বেনা গাজী নিল হাতে।
বিভাগ করিয়া দিল সাত উনানেতে॥
আকৃতানামা কল্মা গাজী পড়িতে লাগিল।
হু হু শব্দে সেই বেনা জ্বলিয়া উঠিল॥
দেখিতে দেখিতে বেনা পুড়ে হয় ক্ষয়।
দুখি দুখি বলে গাজী ডাকে উভরায়॥
মোবারক বলে দুখি আমার পানে চাও।
মুরশিদের নামে খাসী হাজত করে দাও॥
মুরশিদের নামে হাজত করিল তখন।
তাবারক শিরোধার্য্য করেন তখন॥
মিঠাই ফুল সিন্নি দিল বিলাইয়া।
হাজত দিয়া মদনরায় চলে বিদায় হইয়া॥
মদনরায় বলে বাবা বলি তব ঠাই।
বিপদ্‌কালে ডাক্‌লে যেন রাঙ্গা চরণ পাই॥
গাজী বলে মদনরায় না ভাবিও তুমি।
বিপদ্‌কালে ডাক্‌লে তোমায় উদ্ধারিব আমি॥
সেলাম করিয়া রাজা গাজীর চরণে।
চলিলেন মহারাজ আপন ভবনে॥
গাজী সাহেবের পালা সমাপ্ত হইল।
মদনরায়ে লয়ে গাজী জাহির করিল॥

সমাপ্ত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ

বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান রাজত্বের অপরাহ্ণসময়ে ভারতের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পুণ্যকার্য্যে ব্রতী মহারাষ্ট্রজাতির সৈন্যদল দেশের জনসাধারণের উপর যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন—সমগ্র দেশে ধ্বংসের যে তাণ্ডবলীলা দেখাইয়াছিলেন, প্রায় দুই শতাব্দী পরেও বঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত প্রবাদবাক্য তাহার অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকে। আজিও বঙ্গজননীগণ মারাঠা সৈন্য বা বর্গীদিগের কল্পিত আগমনের কথা বলিয়া শিশুসন্তানদিগের মনে ভীতির সঞ্চার ও চক্ষে নিদ্রাকর্ষণের যত্ন করিয়া থাকেন।

বর্গীদিগের বঙ্গাভিযানের সম্পূর্ণ সমসাময়িক কোনও বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত মহারাষ্ট্রপুরাণে এইরূপ এক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ উপনিবদ্ধ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার শেষে একটী তারিখ রহিয়াছে; উহা গ্রন্থরচনার বা লিপিকরের তারিখ, তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে লিপিকর সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ না থাকায় উহাকে গ্রন্থকারের তারিখ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১৭৫০ অব্দে রচিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। সমগ্র মহারাষ্ট্রপুরাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই গ্রন্থের যতটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে এই পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডে (পৃঃ ১৯৩—২৩৬) প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে। তাহার পর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় উহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন[১] এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার ঐতিহাসিক উপযোগিতা আলোচনা করিয়াছেন।[২] 'মহারাষ্ট্র-পুরাণের' আবিষ্কৃত অংশে বঙ্গে বর্গীর উপদ্রবের এক বিস্তৃত, উজ্জ্বল ও হৃদয়বিদারক বিবরণ রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ইহাই এ বিষয়ে প্রাচীনতম ও কতকাংশে সমসাময়িক বিবরণ বলিয়া বিশ্বাস ছিল।

গুপ্তপল্লীর প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-রচিত 'চিত্রচম্পূ' নামক কাব্যগ্রন্থ ১৬৬৬ শকাব্দ বা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।[৩] স্পষ্টতই এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্রপুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বঙ্গে মহারাষ্ট্রাভিযানের সমসাময়িক। যেহেতু, ১৭৪২, ১৭৪৩ এবং ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ—এই তিন

---

[০] ১৩৩৫।৩১শে ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন পঠিত।

১। Bengal Past and Present—Vol. XXVII. pp. 44 ff.

২। *The Bargi Invasion of Bengal*, J. N. Samaddar; Indian Historical Records Commission—Proceedings of Meetings—Vol. VI—pp. 100 ff; *Mahratta Invasion of Bengal, Behar and Orissa*, J. N. Samaddar; Journal of Indian History, 1925, pp. 85 ff.

৩। শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপতিগণিতে কার্ত্তিকীয়ে দশাংশে। পূর্ণাং শ্রীচিত্রচম্পূং ব্যতনুত দিবসে শ্রীল-বাণেশ্বরাখ্যঃ॥ শকাব্দাঃ ১৬৬৬॥

বৎসর তিনবার মহারাষ্ট্রগণ বঙ্গে অভিযান করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।[৪] চিত্রচম্পূ গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রসঙ্গক্রমে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে বর্গীর উপদ্রবের এক জ্বলন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিবরণকেই এ বিষয়ে প্রাচীনতম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এ কথা স্থির যে, এ বিষয়ে অন্য যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার কোনটীরই তারিখ এত প্রাচীন বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। ঘটনার সমসাময়িক বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক প্রামাণ্যও যথেষ্ট, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গ্রন্থের রচয়িতা বাণেশ্বর কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শাস্ত্ররসিক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্‌রূপে সকলের নিকট সুপরিচিত। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌এর প্রযত্নে বিবাদার্ণবসেতু নামে (Code of Gentoo Law) এগার জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক হিন্দু আইনের যে নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার একজন রচয়িতা এই বাণেশ্বর। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভট কবিতা আজ পর্য্যন্ত বঙ্গের পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত এবং আজও উহারা তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের একমাত্র নিদর্শন-রূপে সকলকে মুগ্ধ করে। তিনি যে স্বতন্ত্র একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত। আমাদের উল্লিখিত 'চিত্রচম্পূ' তাঁহার রচিত একখানি গদ্যপদ্যাত্মক স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথি রহিয়াছে। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের সুবিশাল পুস্তকাগারেও এই গ্রন্থের পুথি রহিয়াছে।[৫] বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময় এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইহার মধ্যে বর্গীর উপদ্রবের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এতদিন ইহার পরিচয় সাধারণের গোচর করিতে পারি নাই।

বর্দ্ধমান-রাজবংশের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ চিত্রসেনের (খৃঃ ১৭৪০—১৭৪৪) নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে 'চিত্রচম্পূ'। চিত্রসেন যেমন গ্রন্থের নায়ক—সেইরূপ তাঁহারই এক কল্পিত মৃগয়াভিযান গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। চিত্রসেনের সভাসদ্‌রূপেই বাণেশ্বর এই গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কোনও কারণে মনোমালিন্য হওয়ায় বাণেশ্বর কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানাধিপতি চিত্রসেনের সভায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই সময়ই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তবে গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বরের মত সভাসদ্‌কে বেশী দিন ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে পুনরায় নিজ সভায় আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থের নায়ক মহারাজ চিত্রসেনের প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, রাজ্যপালনে নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গেই 'খণ্ডপ্রলয়বিধিৎসু' 'সর্ব্বসর্ব্বস্বাপহরণ-স্বেচ্ছাবিহরণ-

---

৪। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস নবাবী আমল—পৃঃ ১৫১-৫৭।

৫। *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library, London*, Vol. VII. No. 4044.

প্রতিষিদ্ধাচরণমাত্রনিপুণ' 'গর্ভবত্যর্ভকদৈবতদ্বিজস্থদীনদারণদারুণপণ' 'কৃপাকৃপণ' 'প্রচণ্ডশীল' 'বর্গিবর্গ' মহাধূমকেতুর ন্যায় মহারাজ সাহুর বিপুলবাহিনীর বঙ্গে আগমন, প্রজাবর্গের ভীতি ও মহারাজ চিত্রসেন কর্ত্তৃক তাহাদের আশ্রয়দানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বর্গীদিগের অতর্কিত আগমনের সংবাদে বর্গীর অত্যাচারের বসন্ত 'নিসর্গভীরু' 'গৌড়জনপদপ্রকৃতি'গণ বড়ই বিপন্ন ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তারপর শকটে, শিবিকায়, উষ্ট্রে, অশ্বে, নৌকায় ও পদব্রজে সকলে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। পলায়মান ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধোপরি 'লম্বালক' শিশু, গলদেশে দোদুল্যমান আবাধ্য শালগ্রামশিলা, মনের মধ্যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 'দুর্ব্বহমহাভার' সঞ্চিত শাস্ত্রগ্রন্থরাশির বিনাশের আশঙ্কা, গর্ভভারালস পলায়মান রমণীগণের নিদাঘসূর্য্যের অসহনীয় তাপক্লেশ, যথাসময় পানাহার লাভে বঞ্চিত ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল শিশুগণের করুণ চীৎকারে ব্যথিত জননী-গণের আর্ত্তনাদ এবং অসহ্য বেদনায় সমস্ত পৃথিবীকে বর্গীময় বলিয়া ধারণা করা—এ সমস্তই কবি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় সুললিত ভাষায় অতি চমৎকার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রজাবৃন্দের এই দারুণ কষ্টে স্থির থাকিতে না পারিয়া মহারাজ চিত্রসেন বিপুল বাহিনীর দ্বারা সমস্ত ভূমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং বর্দ্ধমান নগর রক্ষার ভার মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া শরণাগত প্রজাবৃন্দ যাহাতে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে লইয়া দক্ষিণ-প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরের মধ্যস্থিত বিশালা-নাম্নী 'বিশালা' নগরীতে উপস্থিত হইলেন। এই দক্ষিণপ্রয়াগ সম্ভবতঃ সপ্তগ্রামান্তর্গত ত্রিবেণী। কিন্তু কোন্ স্থানকে 'বিশালা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনসংবাদ শুনিয়াই তাহাদের অত্যাচারাভিজ্ঞ বঙ্গবাসিগণ যে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল, ইহা কেবল তাহাদের স্বভাবভীরুতার পরিচয় বলিয়া মনে হয় না। ইতঃপূর্ব্ব অভিযানে (বোধ হয় ১৭৪২ ও ৪৩ খৃষ্টাব্দের) বর্গীর দল রমণী, বালক, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও দরিদ্রের বিনাশ-কার্য্যে যেরূপ তৎপরতা দেখাইয়াছিল এবং যাহার কথা কবি কেবল দুইটী পদের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন ('গর্ভবত্যর্ভকদৈবতদ্বিজস্থদীনদারণদারুণপণ' 'সর্ব্বসর্ব্বস্বাপহরণ-স্বেচ্ছাবিহরণপ্রতিষিদ্ধাচরণমাত্রনিপুণঃ'), তাহারই জ্বলন্ত স্মৃতি তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহারই অস্পষ্ট স্মৃতি আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা হইতে লুপ্ত হয় নাই।

চিত্রচম্পূর যে অংশে এই বিবরণটী প্রদত্ত হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ইত্থমতিবিরাজমানে রঞ্জিতপ্রকৃতিসমাজে মহারাজাধিরাজে ত্রিনয়ননয়নবেদযোগাঙ্ক-যুগ-সঙ্খ্যাকেষু সমতীতেষু তুর্য্যযুগহায়নেষু বেদাঙ্গষণ্মুখমুখসোমসম্মিতাসু ? সমতীতাসু শকভূপাল-সমাসু প্রথমরাশিমধ্য-সঞ্চারলীলাশালিনি ভগবতি মরীচিমালিনি অকালমহাপ্রলয়মহাজলধরব্যূহ ইব সম্বর্ত্তপ্রবর্ত্তমানপ্রচণ্ডপ্রবহোদ্বহমহাপ্রভঞ্জনসঞ্চয়সঞ্চার্য্যমাণঃ সঞ্জনয়ন্নিব মধ্যন্দিনদিননায়ক-রাকারোহিণীরমণয়োরপ্যন্ধীকরণমন্ধকারনিকরং তমোময় ইব তমালতরুময় ইব রজোময় ইব রজনী-চরচমূচক্রময় ইব কলিকালকলিতকঠোরকল্মষকলাপময় ইব কৃপাকৃপণঃ কৃপাণপাণির্গর্ভবত্যর্ভক-

দৈবতদ্বিজস্থহৃদীনদারণদারুণপণঃ সর্ব্বসর্ব্বস্বাপহরণস্বেচ্ছাবিহরণপ্রতিষিদ্ধাচরণমাত্রনিপুণঃ প্রবল-বল-বহলহলহলাকোলাহলহেষাবৃংহিতি-চীৎকৃতি-ভেরীভাঙ্কৃতি-ঘণ্টাটঙ্কৃতি-খড়্গাঝাঙ্কৃতি-বীরহুঙ্কৃতি-সিংহ-নাদভূরিভৈরবরবনিবহভরিতভূমণ্ডলো মহারাষ্ট্র-মহীন্দ্রসাহুরাজচমূসমূহোঽকাণ্ড এবাকাণ্ডকোদণ্ড-খণ্ড-প্রলয়ং বিধিৎসুরিব প্রচণ্ডশীলো গৌড়জনপদজনগণ-সমুন্মূলনহেতুর্মহাধূমকেতুরিব সমুত্তস্থৌ ॥১২॥

যান্ত্যেকেন দিনেন যোজনশতং হীনাস্ত্রদীনান্ স্ত্রিয়ো
বালান্ ঘ্নন্তি হরন্তি বিত্তমখিলং সাধ্বীশ্চ সীমন্তিনীঃ।
সংগ্রামে সমুপস্থিতে সুনিভৃতং দেশান্তরে সুদ্রুতং
ধাবন্ত্যদ্ভুতবেগবাজিনিবহো যেষাং প্রধানং বলম্ ॥৩৪॥

এবমাদিবিশ্রুতস্বরূপচারিত্র্যঃ সংমিলিত এষ মহান্ নিসর্গদুর্গমো বর্গিবর্গ[া]ণাং সৈন্যসাগর ইতি নিসর্গভীরুভাবভঙ্গুরাণাং গৌড়জনপদপ্রকৃতীনাং কিং কর্ত্তব্যং ক্ব গন্তব্যং ক্ব স্থাতব্যং ক উপায়ঃ কঃ সহায় ইতি হা দেব কিমিদমনুষ্ঠিতমতিনিষ্ঠুরমিতি চ দিশি দিশি অকাণ্ডপ্রকাণ্ড-প্রচণ্ডবজ্রাভিঘাতখণ্ড্যমানগণ্ডশৈলমণ্ডলচণ্ডরণিতজনিত ইব মন্দরমহীধরোদ্দামমন্থনামর্দ্দান্দোলিতা-ম্ভোরাশিমহাম্ভোধিনিবহবহলকল্লোলনিকরসঞ্জনিত ইব সম্পূরয়ন্নাশাবিবরমপি রোদসীকন্দরোদর-দূরিতশব্দান্তরগ্রহণাবসরো বভূব সুমহান্ কোলাহলঃ ॥১৩॥

ততশ্চ শকটশিবিকাশ্বস্বৈরমতুরঙ্গমতরণিভিশ্চঙ্ক্ম্যমানৈশ্চক্রমেলকচক্রৈরসংক্রমমাক্রামদ্ভি-রাচামন্তিরিবাশাচক্রবালং ধনজনভারমন্থরসঞ্চারৈরবিরতিবিস্তারৈর্ধাবতাং মহাধন[া]নাং গৃহীত-গৃহসারাম্বরভূষণভাজনানামঙ্কাবলম্বিতলম্বালকলোলবালকানাং গ্রীবাবলম্বিতশালগ্রামশিলানাং দুর্ব্বহমহাভাববিবিধশাস্ত্রপুস্তকসঞ্চয়াপচয়চিন্তাসন্তাপজ্বরজর্জ্জরাণাং ভূমিনির্জ্জরাণাং দুর্ব্বহগর্ত্তভার-মন্থরাণাং নিতম্ববিম্বকুচকুম্ভদ্বন্দ্বভারালসানাঞ্চ পঙ্কসঙ্কটকুশকাশকণ্টকাঙ্কুরশঙ্কয়া পদে পদে স্ফুরিতাতঙ্কানাং নিদাঘসময়ে সমেধমানমধ্যন্দিননিদাঘদীধিতিদীধিতিব্রাততীব্রতাপপ্রতাপ-মসহমানানাং যথাসময়মমিলিতপানাহারতয়া ক্ষুত্তৃড়্ব্যাকুলিতার্ত্তকরোদনার্ত্তব্যাহারকাতরহৃদয়ানাং প্রমদানাং করুণকরুণার্ত্তপরিদেবিতরুদিতৈর্ব্যাকুলানাং বর্গিবর্গময়মিব নিখিলস্বর্গমনুভবন্তীনাঞ্চ বিবিধার্ত্তনাদেন মিথোঽনুবাদেন চ ক্ষুভিতমিব ক্ষমামণ্ডলমভবৎ ॥১৪॥ তথাহি।

পদ্মানামহমেব বান্ধব ইতি খ্যাতং ত্রিলোকীতলে
কিং নৈতানি মুখাম্বুজানি কুলজাবৃন্দস্য দৃষ্টান্যপি।
ইত্থং খেদবশাৎ সহস্রগলিতৈস্তীব্রৈঃ করৈরেকদা
তান্যাকর্ষতি নিশ্চিতং প্রকুপিতঃ শ্রীমান্ দিনাধীশ্বরঃ ॥৩৫॥

এতস্মিন্নেবাবসরে মহতা চমূসমূহেন সচিবসমাজাধিরাজং বর্দ্ধমাননগরমধিসংস্থাপ্য মহারাজঃ সমন্তাশাচক্রাক্রামিণা মহাবিক্রমশালিনা বৃহতা বলব্যূহেনাচ্ছাদ্য ভূমিবলয়মনন্যপরায়ণশরণাগত-করুণাস্পদদরিদ্রদ্বিজগণভূয়িষ্ঠম্প্রজাসমূহমকুতোভয়সঞ্চারং সংস্থাপয়িতুমভিনবনিজাধিকারদক্ষিণ-প্রয়াগগঙ্গাসাগরসঙ্গমতীর্থদ্বয়াভ্যন্তরালমহীবলমণ্ডনায়মানাং বিশালাং নাম বিশালাং নগরী-মাজগাম ॥১৫॥

এই বিবরণের সহিত মহারাষ্ট্রপুরাণের বিবরণের পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া উপেক্ষা করিবার কোনও কারণ নাই। এই দুই বিবরণ হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ হিন্দু হইয়াও অসহায় বালক ও অবলা নারীর উপরও অত্যাচার করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করে নাই। তাই তাহাদের ভয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গললনাগণ শিহরিত হইয়া উঠিতেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার

শিশুমাব একপ্রকাব জলজন্তু। আজকাল ইহাকে শিশুক বা শুশুক বলা হয়, ইংবাজি নাম Gangetic porpoise or dolphin। কিন্তু বেদ ও পুবাণাদিতে যে শিশুমাবেব উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এই জন্তু নহে। এই জলজন্তুব আকৃতি কল্পনা করিয়া আকাশেব একটী তাবা-সমষ্টিকে শিশুমাব নামে অভিহিত কবা হইয়াছে। এই শিশুমাবেব প্রকৃত সংস্থান কোথায, তাহাব আলোচনা কবাই এই প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য।

আমবা ঋগ্বেদেব প্রথম মণ্ডলে ১১৬ শ সূক্তেব ১৮ ঋকে দেখিতে পাই,—

যদয়াতং দিবোদাসায় বর্তিভবদ্বাজায়াশ্বিনা হয়ন্তা।
বেবদুবাহ সচ নো বথো বাং বৃষভশ্চ শিংশুমাবশ্চ যুক্তা।

অর্থাৎ, হে অশ্বিনীদ্বয়, (আপনাবা) আহূত হইযা যখন দিবোদাস এবং ভবদ্বাজেব গৃহে গিয়াছিলেন, (তখন) আপনাদেব সেব্য বথ অন্ন বহন কবিয়াছিল, (তাহাতে অর্থাৎ সেই বথে) বৃষভ ও শিশুমাব যুক্ত (বাধা) ছিল।

এ স্থলে জলজন্তু শিশুমাব বৃষভেব সহিত কিরূপে স্থলেব উপব বথেব সহিত যুক্ত হইতে পাবে? সুতবাং এই শিশুমাবকে একটী তাবকামণ্ডল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তৈত্তিরীয় সংহিতায (৫।৫।১১) সমুদ্রেব প্রীতিব জন্য শিশুমাবেব বলিদানেব উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায়ও (২৪।৩০) ঐরূপ বলিদানেব কথা আছে। কিন্তু জলজন্তু, বিশেষতঃ শিশুমারেব বলিদান কার্য্যতঃ কত দূব সম্ভব, সে বিষয়ে ভাবিবাব আছে।

তৈত্তিবীয় আবণ্যকে (২।১৯) আমবা দেখিতে পাই,—

যস্মৈ নমস্তচ্ছিবো ধর্ম্মো মূর্ধানং ব্রহ্মোত্তবা হনুর্যজ্ঞোঽধবা বিষ্ণুর্হৃদয়ং সংবৎসবঃ প্রজননমশ্বিনৌ পূর্বপাদাবত্রির্মধ্যং মিত্রাবকণাবপবপাদাবগ্নিঃ পুচ্ছস্য প্রথমং কাণ্ডং তত ইন্দ্রস্ততঃ প্রজাপতিবভয়ং চতুর্থং—স বা এষ দিব্যঃ শাংকবঃ শিশুমাবস্তং হ—

ধ্রুবস্ত্বমসি ধ্রুবস্য ক্ষিতমসি ত্বং ভূতানামধিপতিবসি ত্বং ভূতানাং শ্রেষ্ঠোঽসি ত্বাং ভূতান্যুপপর্যা-বর্তন্তে নমস্তে নমঃ সবং তে নমো নমঃ শিশুমাবকুমারায় নমঃ।

অর্থাৎ যাঁহাকে (পবমব্রহ্মকে) নমস্কাব (করা যাইতেছে), তিনি (শিশুমাবেব) মস্তক, ধর্ম্ম মূর্ধস্থানীয়, ব্রহ্ম (তাঁহাব) উত্তব হনু, যজ্ঞ (তাঁহাব) নিম্ন হনু, বিষ্ণু (তাঁহাব) হৃদয়, সংবৎসব (তাঁহার) জননেন্দ্রিয়, অশ্বিনীদ্বয় পূর্ব্বপাদদ্বয়, অত্রি মধ্যদেহ, মিত্রাবরুণদ্বয় অপর দুই পাদ, পুচ্ছের প্রথম ভাগে অগ্নি, দ্বিতীয় ভাগে ইন্দ্র, তৃতীয় ভাগে প্রজাপতি, চতুর্থ ভাগে অভয় (পরমব্রহ্ম)।

(শিশুমার!) আপনি ধ্রুব, ধ্রুবেব বাসস্থান, আপনি ভূতগণের (প্রাণিগণের) অধিপতি,

* ১৩০৫।৩১এ ভাদ্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আপনি প্রাণিগণের (মধ্যে) শ্রেষ্ঠ, ভূতগণ (প্রাণিগণ) আপনাকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্ত্তন করিতেছে (ঘুরিতেছে), আপনাকে নমস্কার, আপনাদের সকলকে নমস্কার, শিশুমারকুমারকে নমস্কার।

এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

কয়েকখানি পুরাণে আমরা শিশুমারের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই ; এই বিবরণ তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে গৃহীত হইয়া কথঞ্চিৎ বিস্তারিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশ ৯ম অধ্যায় এবং ব্রহ্মপুরাণের ২৪শ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই,—

তারাময়ং ভাগবতং শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবি রূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ॥

অর্থাৎ আকাশে ভগবান্ প্রভু হরির যে তারকাময় শিশুমারাকৃতি রূপ আছে, তাহার পুচ্ছে ধ্রুব অবস্থিত।

পুনশ্চ বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশ ১২শ অধ্যায়ে দেখা যায়,—

শিশুমারস্তু যঃ প্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি।
সন্নিবেশঞ্চ তস্যাপি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম॥
উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়োঽপ্যুত্তরো হনুঃ।
যজ্ঞোঽধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ॥
হৃদি নারায়ণশ্চাস্তে অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ।
বরুণশ্চার্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সক্থিনী।
শিশ্নং সংবৎসরস্তস্য মিত্রোঽপানং সমাশ্রিতঃ॥
পুচ্ছেঽগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ কশ্যপোঽথ ততো ধ্রুবঃ।
তারকা শিশুমারস্য নাস্তমেতি চতুষ্টয়ম্॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার কাছে যাহাকে শিশুমার বলা হইয়াছে এবং যেখানে ধ্রুব অবস্থিত, তাহার সন্নিবেশ (বলা হইতেছে), শ্রবণ করুন। উত্তানপাদ তাহার উত্তর হনু বলিয়া জ্ঞাত, যজ্ঞ (তাহার) নিম্নহনু বলিয়া জ্ঞাত ; ধর্ম্ম মস্তক আশ্রয় করিয়া আছে। হৃদয়ে নারায়ণ, তাহার সম্মুখের দুই পদে অশ্বিনীদ্বয়, বরুণ ও অর্যমা পশ্চিমে (তাহার) উরুদ্বয়, শিশ্ন তাহার সংবৎসর, মিত্র (তাহার) অপান (উদর) আশ্রয় করিয়া আছে ; পুচ্ছে অগ্নি, মহেন্দ্র, কশ্যপ এবং তাহাদের পর ধ্রুব অবস্থিত, শিশুমারের এই চারিটী তারকা কখনও অস্ত যায় না।

বায়ুপুরাণের ৫২ অধ্যায় এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৫৭ অধ্যায়ে আমরা ঐ শ্লোক কয়টা দেখিতে পাই। এই দুই পুরাণে আমরা ধ্রুব সম্বন্ধে আরও কয়টী শ্লোক দেখিতে পাই,—

এবং ধ্রুবনিবদ্ধোঽসৌ সর্পতে জ্যোতিষাং গণঃ।
সৈব তারাময়ো জ্ঞেয়ঃ শিশুমারো ধ্রুবো দিবি॥

নক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যাশ্চ গ্রহস্তারাগণৈঃ সহ ।
উন্মুখাভিমুখাঃ সর্ব্বে চক্রীভূতাশ্রিতা দিবি ॥
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে ধ্রুবমেব প্রদক্ষিণম্ ।
প্রায়ান্তীহ বরং শ্রেষ্ঠমেধীভূতং ধ্রুবং দিবি ॥
ধরাগ্নিকশ্যপানাস্ত বরশ্চাসৌ ধ্রুবঃ স্মৃতঃ ।
এক এব ভ্রমত্যেষ মেরুপর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥

এইরূপে ধ্রুবের সহিত সংবদ্ধ হইয়া জ্যোতিষ্কগণ ঘুরিতেছে। সেই তারাময় ধ্রুব আকাশে শিশুমার বলিয়া জ্ঞাত। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহতারাগণের সহিত উন্মুখ (ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া) এবং অভিমুখ (অধোমুখ) হইয়া সকলে চক্রাকারে আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাহারা ধ্রুবের দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করে। আকাশে তাহারা শ্রেষ্ঠ পূজনীয় মেধীভূত (প্রধান স্তম্ভে পরিণত) ধ্রুবের চারি দিকে ভ্রমণ করে। ধ্রুব, অগ্নি ও কশ্যপদের মধ্যে ধ্রুবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানা আছে। একই মাত্র (ধ্রুব) মেরু পর্ব্বতের মস্তকে ভ্রমণ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ২৩ অধ্যায়ে যে শিশুমারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা অন্যরূপ। এই বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল,—

কেচিদেতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য যোগধারণায়ামনুবর্ণয়ন্তি। যস্য পুচ্ছাগ্রেঽবাক্‌শিরসঃ কুণ্ডলীভূতদেহস্য ধ্রুব উপকল্পিতঃ। তস্য লাঙ্গুলে প্রজাপতি-রগ্নিরিন্দ্রো ধর্ম্ম ইতি পুচ্ছমূলে ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়ঃ। তস্য দক্ষিণাবর্ত্তকুণ্ডলীভূত-শরীরস্য যান্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বে নক্ষত্রাণি উপকল্পয়ন্তি দক্ষিণায়নানি তু সব্যে যথা শিশুমারস্য কুণ্ডলাভোগসন্নিবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপ্যবয়বাঃ সমসংখ্যা ভবন্তি। পৃষ্ঠে ত্বজবীথী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ। পুনর্ব্বসুপুষ্যৌ দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণ্যোরার্দ্রাশ্লেষা চ দক্ষিণবাময়োঃ পাদয়ো-রভিজিদুত্তরাষাঢে দক্ষিণবাময়োর্নাসিকয়োর্যথাসংখ্যং শ্রবণ-পূর্ব্বাষাঢে দক্ষিণবাময়োর্লোচনয়ো-র্ধনিষ্ঠামূলঞ্চ দক্ষিণবাময়োঃ কর্ণয়োর্মঘাদীন্যষ্টনক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্ববঙ্ক্রিষু যুঞ্জীত। তথৈব মৃগশীর্ষাদীন্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বেষু প্রাতিলোম্যেন যুঞ্জীত। শতভিষাজ্যেষ্ঠে স্কন্ধয়ো-র্দক্ষিণবাময়োর্ন্যসেৎ।

অর্থাৎ, কেহ কেহ বলেন যে, ভগবান্ বাসুদেবের যোগ ধারণের জন্য এই শিশুমারাকৃতি দ্বারা জ্যোতিশ্চক্র (কল্পিত হইয়াছে)। যে অধোমস্তক কুণ্ডলীদেহ শিশুমারের পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব অবস্থিত, তাহার লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম্ম, পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা ; কটিদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল। দক্ষিণাবর্ত্ত কুণ্ডলীভূত দেহবিশিষ্ট শিশুমারের দক্ষিণ পার্শ্বের নক্ষত্রগুলি উত্তরায়ণগত এবং বাম পার্শ্বের নক্ষত্রগুলি দক্ষিণায়নগত। কুণ্ডলীকৃত দেহবিশিষ্ট শিশুমারের দুই পার্শ্বের অঙ্গ সম-সংখ্যক, পৃষ্ঠে অজবীথী (দক্ষিণমার্গের ১ম ভাগ—মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া) ; উদরে আকাশগঙ্গা, দক্ষিণ ও বাম শ্রোণিতে যথাক্রমে পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা ; দক্ষিণ ও বাম পদে আর্দ্রা ও অশ্লেষা, নাসিকার দক্ষিণ ও বাম দিকে অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া ; দক্ষিণ ও বাম নেত্রে শ্রবণা

ও পূর্ব্বাষাঢ়া , দক্ষিণ ও বাম কর্ণে ধনিষ্ঠা ও মূলা , মঘা হইতে অনুরাধা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়নের অষ্ট নক্ষত্র বাম পার্শ্বে বস্ত্রি পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত। সেই মত মৃগশীর্ষ হইতে প্রতিলোমক্রমে পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত উত্তরায়ন সম্বন্ধীয় অষ্ট নক্ষত্র দক্ষিণ পার্শ্বে সংযুক্ত। দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা।

মৎস্যপুরাণের ১২৫ অধ্যায়ে শিশুমার সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

যোঽসৌ চতুর্দ্দশর্ক্ষেষু শিশুমারো ব্যবস্থিতঃ।
উত্তানপাদপুত্রোঽসৌ মেঢীভূতো ধ্রুবো দিবি॥

অর্থাৎ ওই যে শিশুমার চতুর্দ্দশ (অর্থাৎ সংখ্যায় ১৪টী) তারকায় অবস্থিত, উত্তানপাদ-পুত্র ওই ধ্রুব মেঢীভূত হইয়া আকাশে (অবস্থিত)।

ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের উত্তর কাণ্ডে আমরা দেখিতে পাই,—

মহর্ষিমণ্ডলান্যতিক্রম্য সূর্য্যসোমমণ্ডলে ভিত্বা কীলকনারায়ণং ধ্যাত্বা ধ্রুবমণ্ডলস্য দর্শনং কৃত্বা ভগবন্তং ধ্রুবমভিপূজ্য ততঃ শিংশুমারচক্রং বিভিদ্য শিংশুমারপ্রজাপতিমভ্যর্চ্য চক্রমধ্যগতং সর্ব্বাধারং সনাতনং মহাবিষ্ণুমারাধ্য ...

অর্থাৎ, মহর্ষিমণ্ডলগুলি অতিক্রম করিয়া, সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া, কীলকনারায়ণকে ধ্যান করিয়া, ধ্রুবমণ্ডল দর্শন করিয়া, ভগবান্ ধ্রুবকে পূজা করিয়া, তৎপরে শিংশুমারচক্র ভেদ করতঃ শিংশুমারপ্রজাপতিকে অর্চ্চনা করতঃ চক্রমধ্যস্থ সর্ব্বাধার সনাতন মহাবিষ্ণুকে আরাধন করিয়া

এক্ষণে আমরা জ্যোতিষ-গ্রন্থে কি পাওয়া যায়, তাহা দেখি। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের বাসনাভাষ্যে জৈনদিগের দুই সূর্য্যমত খণ্ডন উপলক্ষে ধ্রুবমৎস্যের উল্লেখ দেখা যায়,—

যদা ভরণীস্থো রবির্ভবতি তদা তস্যাস্তময়কালে ধ্রুবমৎস্যস্তির্য্যকস্থো ভবতি। তস্য মুখতারা পশ্চিমতঃ। পুচ্ছতারা পূর্ব্বতঃ। তদা মুখতারাসূত্রে রবিরিত্যর্থঃ। অথ নিশাবসানে মুখতারা পরিবর্ত্ত্য পূর্ব্বতো যাতি। ততো মুখতারা-সূত্রগতস্যৈবার্কস্যোদয়ো দৃশ্যতে।

অর্থাৎ, যখন সূর্য্য ভরণীতে গমন করেন, তখন তাঁহার অস্তসময়ে ধ্রুবমৎস্য তির্য্যগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকে। তাহার মুখতারা পশ্চিমে ও পুচ্ছতারা পূর্ব্বদিকে। তখন মুখতারা এবং সূর্য্য একসূত্রগত হয়। রাত্রিশেষে মুখতারা ঘুরিয়া পূর্ব্বদিকে এবং পুচ্ছতারা পশ্চিমে যায়, তখন মুখতারার একসূত্রপাতে অবস্থিত সূর্য্যের উদয় দেখা যায়।

আমরা এক্ষণে কয়েকজন আধুনিক পণ্ডিতের মত বিবৃত করিব।

পণ্ডিত কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূগোলচিত্রে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্যএম্ এ মহাশয়ের "The Stars in the Northern Tropics" নামক নক্ষত্রের মানচিত্রে Ursa Minorকে শিশুমার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যোগেশবাবুও এই মতের পক্ষপাতী (আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী)।

শ্রীযুক্ত ধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "The Hindu Nakshatras" [Journal of the Department of Science, Calcutta University, Vol VI.] নামক প্রবন্ধে শিশুমার ও ধ্রুবমৎস্য একই তাবকাপুচ্ছ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার সংস্থান এইরূপে নির্দ্ধাবিত হইয়াছে,—Ursa Minor এব গামা, বিটা, ৫ম ও ৪র্থ তারকাগুলি ধ্রুবমৎস্যেব পুচ্ছে অবস্থিত, গামা এবং Dracoব ইটা, জিটা ও বিটা ইহাব দেহেব পবিপ্রান্তে সংস্থিত, এবং বিটা, ক্সি, গামা ও Hercules এর ই ও টা দ্বারা ইহার মস্তক গঠিত।

আমবা এক্ষণে শিশুমারেব অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা কবিব।

প্রথমে দেখা যাউক, কাশীনাথবাবু ও তাবকনাথবাবুব শিশুমাব Ursa Minor হইতে পাবে কি না। আমবা দেখি যে, Ursa Minorএব শেষ তাবাটীই ধ্রুবতারা, কিন্তু তাহা আধুনিক ধ্রুবতাবা, প্রাচীন ধ্রুবতাবা হইতে পারে না। আমবা জানি যে, ধ্রুব (north pole) ধীরে ধীবে কদম্বের (ecliptic pole) চাবিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বৃত্তাকাবে আবর্ত্তিত হইতেছে, এক পূর্ণ আবর্ত্তনে প্রায় ২৫৮৬৪ বৎসব অতিবাহিত হয়। সুতবাং আধুনিক ধ্রুববিন্দুব পূর্ব্বদিকে বহু দূরে প্রাচীন ধ্রুব অবস্থিত ছিল। ভাস্কবাচার্য্যেব বিবরণে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে তাঁহার ধ্রুবমৎস্য এই Ursa Minor হওয়া সম্ভবপব নহে। ভাস্কবেব ধ্রুবমৎস্যেব মুখে ও পুচ্ছে একটী কবিয়া তাবকা আছে, যে ধ্রুবমৎস্যেব যে সূর্য্যেব সহিত সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পাবা যায় যে, তাঁহাব ধ্রুবমৎস্যেব মুখতাবা ধ্রুবে অবস্থিত। ভাস্কবাচার্য্য ১০৭২ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাব সিদ্ধান্তশিবোমণি বচনা কবেন, ঐ সময়ে ধ্রুব Camelopardus নক্ষত্রপুঞ্জের একটা ৫মপ্রভ তাবকাব নিকট অবস্থিত ছিল, ঐ তারকাটী আধুনিক ধ্রুব ও Ursa Minorএব ৪র্থ তাবকাব মধ্যে (শেষোক্ত তাবাব দিকে) অবস্থিত; তাহা হইলে ইহাই ভাস্কবাচার্য্যেব ধ্রুবমৎস্যেব মুখতাবা। আবও বলা হইয়াছে যে, ধ্রুবমৎস্যেব মুখতাবা পূর্ব্বদিকে ভরণীর দিকে থাকে এবং পুচ্ছতাবা মুখতাবাব বিপবীত দিকে পশ্চিমে থাকে; তাহা হইলে পুচ্ছতাবাটী Dracoব কোন একটী তাবা, যেমন ইটা হওয়া সম্ভব; ধ্রুবমৎস্যটী অতি ক্ষুদ্র কল্পনা কবিলে Ursa Minorএব বিটা বা গামা ধবা যাইতে পারে, কিন্তু Ursa Minorকে ধ্রুবমৎস্য বলা যাইতে পাবে না। পুবাণেব বিস্তৃত বিবরণে দেখা যায় যে, শিশুমার ধ্রুবমৎস্য হইতে বহুগুণ বৃহত্তর এবং তাহা কখনই ভাস্কবেব ধ্রুবমৎস্য হইতে পাবে না। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পৌরাণিক শিশুমার ভাস্করেব ধ্রুবমৎস্য নহে এবং Ursa Minorও হইতে পারে না।

এক্ষণে ধীবেন্দ্রবাবুব ধ্রুবমৎস্য বা শিশুমাব ভাস্করেব ধ্রুবমৎস্য এবং পৌরাণিক শিশুমারেব সহিত তুলনা করা যাউক। ধীবেন্দ্রবাবুব শিশুমাবকে ঠিক ভাস্করের ধ্রুবমৎস্য বলিয়া লওয়া চলে না; প্রথমতঃ শিশুমারেব মস্তক কখনই ধ্রুবমৎস্যের মস্তক হইতে পারে না, শিশুমারের পুচ্ছের অগ্রতাবকা ভাস্করাচার্য্যেব সময়েব ধ্রুবতারা ছিল না। যদি শিশুমারের পুচ্ছ আরও বর্দ্ধিত কবিয়া পূর্ব্বোক্ত তাবাটীব সহিত সংযুক্ত কবিয়া, ঐ দিকে শিশুমারের মস্তক কল্পনা করা যায় এবং আবও কয়েকটী বড় তারা শিশুমারের দেহে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, মস্তকের দিক্ পুচ্ছ

বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে শিশুমারটীকে ভাস্করের ধ্রুবমৎস্যের তুল্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ধীরেন্দ্রবাবুর শিশুমার ভাস্করের ধ্রুবমৎস্য নহে। ধীরেন্দ্রবাবুর শিশুমার পৌরাণিক শিশুমার হইতেই পারে না। কারণ, পৌরাণিক শিশুমার অতি বৃহৎ, সপ্তর্ষি তাহার কটিদেশের অন্তর্গত, তাহার পুচ্ছে ধ্রুব অবস্থিত। আবার এই সকল কারণে ভাস্করাচার্য্যের ধ্রুবমৎস্য ও প্রাচীন কালের শিশুমার এক হইতে পারে না।

অতঃপর আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যক, মহানারায়ণোপনিষদ্ এবং কয়েকখানি পুরাণে যে শিশুমারের বিবরণ দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং পুরাণগুলিতে শিশুমারের যে অঙ্গসংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তালিকাবদ্ধ করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিশুমারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	তৈত্তিরীয় আরণ্যক	বিষ্ণুপুরাণ	শ্রীমদ্ভাগবত
দেহ			দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীকৃত
মস্তকের উপরিভাগ (মূর্দ্ধা)	ধর্ম্ম		
মস্তক	পরমব্রহ্ম		
নাসিকা			
দক্ষিণদিক			অভিজিৎ (Vega)
বামদিক			উত্তরাষাঢ়া (Phi or gamma Sagittarii)
দক্ষিণচক্ষু			শ্রবণা (Altair)
বামচক্ষু			পূর্ব্বাষাঢ়া (Delta Sagittarii)
দক্ষিণকর্ণ			ধনিষ্ঠা (Alpha or Beta Delphini)
বামকর্ণ			মূলা (Lambda Scorpionis)
উত্তরহনু	ব্রহ্মা	উত্তানপাদ	
নিম্নহনু	যজ্ঞ	যজ্ঞ	
দক্ষিণস্কন্ধ			শতভিষা (Lambda Aquarii)
বামস্কন্ধ			জ্যেষ্ঠা (Antares)
মধ্যদেহ	অগ্নি		
হৃদয়	বিষ্ণু	নারায়ণ	
উদর		(অপান) মিত্র	আকাশগঙ্গা (Milky Way)
কটি			সপ্তর্ষি
পৃষ্ঠ			অজবীথী

দক্ষিণ ও বাম শ্রোণি			পুনর্বসু (Pollux) ও পুষ্যা (Delta Canceri
শিশ্ন	সংবৎসর	সংবৎসর	মৃগশীর্ষ হইতে পূর্ব্বভাদ্রপদ (প্রতিলোমে)
দক্ষিণ পার্শ্ব			উত্তরায়ণের নক্ষত্র
বাম পার্শ্ব			মঘা হইতে অনুরাধা দক্ষিণায়নের অষ্ট নক্ষত্র
পূর্ব্বপদদ্বয়	অশ্বিনীদ্বয়	অশ্বিনীদ্বয়	
পশ্চাৎপদদ্বয়	মিত্রাবরুণ		আর্দ্রা (Alpha Orionis) (দক্ষিণ) ও অশ্লেষা (Alpha Canceri) (বাম)
উরুদ্বয়		বরুণ ও অর্য্যমা	
পুচ্ছ	অগ্নি (১ম ভাগ)	অগ্নি	অগ্নি
	ইন্দ্র (২য় ভাগ)	মহেন্দ্র	ইন্দ্র
	প্রজাপতি (৩য় ভাগ)	কশ্যপ	প্রজাপতি
	অভয় (পরমব্রহ্ম ৪র্থ ভাগ)	ধ্রুব	ধর্ম্ম
পুচ্ছাগ্র			ধ্রুব
পুচ্ছমূল			ধাতা ও বিধাতা

এই তালিকায় আমরা দেখিতে পাই যে, ভাগবত-পুরাণের অধিক স্থলে তারকা নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অধিক ক্ষেত্রে দেবতার নাম দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ঐ দেবতাগুলি তারকা বা নক্ষত্র হিসাবে কি হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। ধর্ম্ম ও পরমব্রহ্ম মস্তকে থাকায় এবং অভিজিৎ ভাগবত মতে নাসিকার দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া আমরা পরমব্রহ্মকে অভিজিৎ বলিয়া ধরিতে পারি, কারণ, অভিজিতের দেবতা ব্রহ্মা। ধর্ম্ম কোন নিকটস্থ তারকা হইবে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে উত্তর হনুতে ব্রহ্ম অবস্থিত, এবং বিষ্ণু-পুরাণের মতে ঐ স্থানে উত্তানপাদ সংস্থিত। St Petersberg Dictionary, Wilson's Dictionary, এবং Monier Williams' Dictionaryতে উত্তানপাদকে Beta Ursa Minoris বলিয়া ধরা হইয়াছে। বেদে উত্তানপদের উল্লেখ আছে (ঋগ্বেদ, ১০।৭২।৩,৪) ; তথায় বলা হইয়াছে যে, উত্তানপদ হইতে দিক্‌সকল এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, উত্তানপদটী ধ্রুব ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা হইলে ধ্রুবের নিকটস্থ কোন তারাকে উত্তানপাদ বলা যাইতে পারে, তবে মনে রাখা উচিত যে,আধুনিক ধ্রুব সেই ধ্রুব হইতে পারে না। যজ্ঞের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পুরাণে বিষ্ণুর নাম যজ্ঞ দেওয়া হইয়াছে, আবার ঋগ্বেদে বিষ্ণুর পরমপদের উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণে (৫০ অধ্যায়) সপ্তর্ষিমণ্ডলের উর্দ্ধে ও ধ্রুবের নিম্নদেশে বিষ্ণুপদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আমরা এই স্থানকে যজ্ঞ-স্থান বলিয়া ধরিলাম। অত্রি সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি তারকা। বিষ্ণু বা নারায়ণ হৃদয়ে স্থিত, বিষ্ণু শ্রবণার দেবতা, ইহা আকাশগঙ্গার উপরই অবস্থিত এবং শিশুমারের উদরের উপর

আকাশগঙ্গা (Milky Way) বাহিত হইয়াছে , সুতরাং বিষ্ণু শ্রবণা হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রবণা শিশুমারের দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত। যাহা অধিক সম্ভবপর, তাহাই গ্রহণ করা ভিন্ন আর কিছু উপায় নাই এবং সে বিষয়েও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অজবীথী সূর্য্যের দক্ষিণ পথ , ইহার উপর মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র অবস্থিত। শিশ্নে সংবৎসর বলা হইয়াছে, সংবৎসর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসে গঠিত কাল মাত্র। ইহা দ্বারা পূর্ব্ববৎসরের শেষ ও পরবৎসরের প্রারম্ভস্থলকে উদ্দেশ্য করা সম্ভব ; কিন্তু নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। মিত্রাবরুণস্থলে আমরা ভাগবতে আর্দ্রা ও অশ্লেষা দেখি। মিত্র অনুরাধার দেবতা এবং বরুণ শতভিষার দেবতা। অর্য্যমা উত্তরফল্গুনীর দেবতা।

পুচ্ছে কয়েকটী দেবতার নাম আছে। অগ্নি কৃত্তিকার দেবতা ; শতপথব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র মৃগশিরার দেবতা। প্রজাপতির নাম দুই স্থলে আছে। কশ্যপকে Cassiopeiaর একটী তারকা বলিয়া ধরা যায়। ভাগবতে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সপ্তর্ষির কথার উল্লেখ আছে, তাহাতে কশ্যপ প্রভৃতি সাত জন ঋষির নাম পাওয়া যায় , প্রজাপতি সম্ভবতঃ এই Cassiopeia তারকাপুঞ্জের আর একটী তারকা , কারণ, যে সকল ঋষির নাম এই স্থলে উল্লিখিত আছে, তাঁহারা প্রজাপতি নামে অভিহিত। যে স্থলে অভয় নাম উল্লিখিত হইয়াছে, অন্য গ্রন্থে তথায় ধর্ম্মের নাম দেখা যায়, পুনশ্চ ব্রহ্মকে অনেক গ্রন্থে ধর্ম্ম বলা হয়, ব্রহ্ম আবার অভিজিতের দেবতা ; সুতরাং অভিজিৎ আবার পুচ্ছেও থাকিতে পারে। ধাতা ও বিধাতা পুচ্ছমূলে অবস্থিত। ইঁহাদিগকে ব্রহ্মহৃদয় (Alpha Capellae) এবং প্রজাপতি (Delta Aurigae) বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা শিশুমারের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। আমরা মহানারায়ণোপনিষদে মোটামুটি শিংশুমারের স্থানের উল্লেখ দেখি। মহর্ষিমণ্ডল সপ্তর্ষিমণ্ডল ভিন্ন কিছুই নহে। কারণ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ, ইঁহারা মহর্ষি। উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষিমণ্ডল অতিক্রম করিলে ধ্রুবমণ্ডল পাওয়া যাইবে এবং ধ্রুবমণ্ডল পাইতে হইলে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিতে হইবে। ইহাতে মনে হয় যে, আধুনিক সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিস্তার অপেক্ষা প্রাচীন কালের সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিস্তার আরও অধিক ছিল এবং সম্ভবতঃ ইহা সূর্য্য ও চন্দ্রের কক্ষায় আসিয়া পড়িত। প্রক্টর সাহেব তাঁহার Myths and Marvels of Astronomyতে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। ধ্রুবমণ্ডল ও ধ্রুব হইতে শিংশুমারচক্র ভেদ করিলে শিংশুমার প্রজাপতি পাওয়া যাইবে , সুতরাং চক্রাকৃতি শিংশুমার ধ্রুবমণ্ডলের এক পার্শ্বে অবস্থিত এবং ইহার সংস্থান সপ্তর্ষিগণের ঠিক বিপরীত দিকে হইবে। শিংশুমারপ্রজাপতি চক্রের অন্তর্গত ; তাহা হইলে তিনি অভিজিৎ তারকা হওয়াই সম্ভব।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও ভাগবতের শিংশুমার এক অতিকায় চক্র , ইহা ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরের সমুদয় আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। ভাগবতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, ইহার দেহ কুণ্ডলাকৃতি। ভাগবতের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, শিংশুমারের কুণ্ডলীগত দেহ অতি জটিলভাবে ক্রান্তি-

বৃত্তের উত্তরে এবং কোন কোন স্থলে তাহার নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। সুতরাং ইহার আকৃতি ও তারকা সম্বন্ধে ইহার সংস্থান সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। পুচ্ছের তারকাসংস্থান দেখিলে বোধ হয় যে, ইহাও কুণ্ডলীগত এবং ক্রান্তিবৃত্তের নিকট হইতে সর্পের ন্যায় বক্রভাবে ধ্রুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা বৈদিক সময়ের ধ্রুব নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম। আমরা পুরাণগুলিতে দেখিতে পাই যে, মেষের অন্তে বিষ্ণু সঞ্চার হইত (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫৫ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ২।৮ ; শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি)। বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, কৃত্তিকার প্রথম পাদে বিষ্ণুর সঞ্চার হয়। তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণী ও কাঠক সংহিতার নক্ষত্রতালিকার সর্ব্বাগ্রে কৃত্তিকার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের তালিকাতেও প্রথমে কৃত্তিকার নাম আছে। এ স্থলে ব্রাহ্মণাদির সময়ে কৃত্তিকার প্রথম পাদে বিষুব সঞ্চার বা অয়নান্ত (solstice) হইত। অয়নান্ত ধরিলে পৌরাণিক সময়ের ৬৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে উহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হয়। ইহা কিন্তু সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। অধিকন্তু বিষুবসংক্রান্তির পক্ষে একটী প্রমাণ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় কৃত্তিকা হইতে প্রথম চৌদ্দটী নক্ষত্র দেবনক্ষত্র বলা হইয়াছে, ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রান্তিবৃত্তের যে অর্দ্ধভাগ বিষুবদ্‌বৃত্তের উপরে থাকে, তাহাতে যে সকল নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকে দেবনক্ষত্র বলা হয়। কৃত্তিকাদি সাত নক্ষত্র যদি বিষুবদ্‌বৃত্তের নিম্নে এবং অপর কয়টী তাহার উত্তর অথবা ঐরূপে বিপরীত দিকে অবস্থিত হইলে এই কথার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পাদে বিষুবৎ সংক্রান্তি সংঘটিত হইত বলিতে হইবে।

কৃত্তিকার প্রথম পাদে বিষুবৎ সংক্রান্তি সংঘটিত হইলে ধ্রুবের সংস্থান Alpha Draconis (**Thuban**) তারকার নিকটে ধরিতে হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ২৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে ধ্রুব ঐ তারকার নিকটস্থ ছিল।

আমরা শিংশুমার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও পুরাণে যে শিংশুমার উল্লিখিত আছে, তাহা অতি বৃহৎ এবং সমুদয় উত্তরভগোলে বিস্তৃত। সুতরাং তাহা ধীরেন্দ্রবাবু এবং কালীবাবুর শিশুমার হইতে পারে না। ভাস্করাচার্য্যের ধ্রুবমৎস্য ও পৌরাণিক শিংশুমার নহে।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

কবিরাজ গোবিন্দদাস

বৈষ্ণব-কবিতায় যে কয়জন গোবিন্দদাস নামে পদ-রচয়িতা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। ইঁহাকে কবিরাজ অথবা কবীন্দ্র গোবিন্দদাস বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু ইনি যে বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী, সে কথা অতি অল্প লোকেই জানে।

বিশ বৎসরের অধিক হইল, মিথিলায় গিয়া নিঃসংশয়রূপে আমি এই কথা জানিতে পারি। সেই সময়ে এই বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদে পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধগুলি আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষা" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ মাসিক পত্র অথবা পাণ্ডুলিপি আমার কাছে নাই। মিথিলা হইতে একখানা খাতায় গোবিন্দদাসের পদাবলী লইয়া আসিয়াছিলাম। যিনি ছাপাইবার ভার লইয়াছিলেন, তিনি খাতাখানি হারাইয়া ফেলেন, কিন্তু আমার কাছে সকল পদ চিহ্নিত আছে।

কবিরাজ বলিতে বৈদ্য বুঝায়, এই ভিত্তির উপর গোবিন্দদাস বৈদ্যজাতীয় অনুমান করিয়া অনেকে ইঁহার বাসস্থান, বংশ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাস সেন নামক কোন কবি বৈষ্ণব ছিলেন কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। পদকল্পতরুতে যে সকল পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, গোবিন্দদাস নামধারী সকল কবির মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি মিথিলার কবি। সেরূপ পদের সংখ্যা অধিক নয়, কিন্তু যে কয়টি আছে, প্রমাণের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। সে কয়টি পদের প্রতি কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

বৈষ্ণব কবি সকলেই বাঙ্গালী, এই কথাই সকলে জানিত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতিকেই সকলে বাঙ্গালী বলিয়া জানিত। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাজনপদাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির নাম বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য, নিবাস বীরভূম কিম্বা যশোহর। এখন বিদ্যাপতির ভাষায় ও ব্রজবুলিতে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষা যে মিথিলার ভাষা, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা কেহ জানিত না। মূল ও অনুকরণ দুই ব্রজবুলি। সকল বৈষ্ণব কবি বাঙ্গালী, তাঁহাদেরই কেহ কেহ কোন অলৌকিক শক্তিতে এই ব্রজবুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর কোন দোষ দিই না। বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা মিথিলায় শাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে যাইত। আমাদের দেশে মিথিলার ভাষা অনেকে বুঝিত, বিদ্যাপতি ঠাকুর ও গোবিন্দদাস ঝার কবিতা বা পদাবলী মিথিলা হইতে আনীত হইয়া বৈষ্ণব-মহলে প্রচলিত হইয়াছিল। সে কথা কিছু দিনে লোকে ভুলিয়া গেল, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। আমার অনুযোগ মিথিলাবাসীর বিরুদ্ধে। যে মিথিলা এককালে বিদ্যার

---

* ১৩৩৫।৭ই আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ও প্রতিভাব আগাব ছিল, সেখানে মিথিলাব প্রধান কবিদ্বয়েব বিশেষ সমাদর নাই। মৈথিল ও বাংলা প্রায় একই লিপি। কিন্তু মৈথিল ছাপার অক্ষর ঢালাই হয় নাই। দেব-নাগরে কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বিদ্যাপতিব বিবচিত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে, সে সকল গ্রন্থের নামও কেহ জানে না, কিন্তু যে পদাবলী হইতে তাঁহাব অক্ষয় যশ, মিথিলা হইতে তাহা অদ্যাবধি ছাপা হয় নাই।

যে ভাষায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস কবিতা অথবা গীত বচনা কবিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন মৈথিলী। যেমন উত্তর-ভাবতে হিন্দুব ভাষা হিন্দী, তেমনি মিথিলাব ভাষাকে সে দেশে মৈথিলী বলে। মিথিলা হইতে এ ভাষায় কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। মিথিলায় কোন পণ্ডিত এই ভাষাব ব্যাকরণ বচনা কবেন নাই। কোন ইংবাজের প্রণীত মৈথিলী ব্যাকরণ কিংবা কোন ইংবাজেব সঙ্কলিত হিন্দী অভিধান হইতে এই ভাষা শিখিতে বা বুঝিতে পাবা যায় না। বুঝিতে হইলে বেহাবেব চলিত গ্রাম্য হিন্দী ভাষা জানা আবশ্যক, তাহার পব মিথিলায় গিয়া এ ভাষা শিখিতে হয়।

পদকল্পতরুতে ও বৈষ্ণব-কবিতাব অন্য সঙ্কলন গ্রন্থে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসেব পদে স্থানে স্থানে এমন পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে যে, তাহা একেবাবে অর্থশূন্য হইয়া গিযাছে এবং পাঠ সংশোধন কবিবার কোন উপায় নাই। মিথিলাব পুথি ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগেব সাহায্যে আমি এই সকল পদেব সদর্থযুক্ত বিশুদ্ধ পাঠ সংগ্রহ কবিয়াছি। বিস্মৃত ভাষা নকল কবিবাব সময় এ দেশে যে বহুতব লিপিকবপ্রমাদ ঘটিবে, ইহাতে বিস্ময়েব কাবণ কিছুই নাই।

পদ-বচনাব কালে বৈষ্ণব কবিগণ গৌবচন্দ্রেব এবং শ্রীকৃষ্ণেব বন্দনা কবিতেন, অপব কোন অবতারেব বন্দনা কবিতেন না। পদকল্পতরুতে তিন হাজাবেব অধিক পদ আছে, তাহাব মধ্যে শুধু একটি পদে বামচন্দ্রেব বন্দনা পাওয়া যায়। পদটি এই,—

জয় জয় শ্রীল বাম বঘুনন্দন
জনকসুতা রতিকন্ত।
সুব নর বানব খচর নিশাচব
জসু গুণ গাব অনন্ত॥
দূর্ব্বাদল নব সামব সুন্দব
কঞ্জনয়ন বনবীর।
বাম ধনুক ধব দাহিন নিশিত শব
জলধি কোটি গম্ভীর॥
শ্রীপদ পাদুক ধরু ভরতানুজ
চামব ছত্র নিছোরি।
শিব চতুরানন সনক সনাতন
শতমুখ রহু করজোরি॥

ভকত আনন্দন মারুতনন্দন
চরন-কমল কর সেবা।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
হরিনারাএন দেবা॥

অর্থ—রঘুনন্দন জানকীবল্লভ শ্রীল রামের জয় হউক। সুরনর বানর খেচর নিশাচর যাঁহার অনন্ত গুণ গান করেন। নবদূর্ব্বাদল শ্যামল সুন্দর রণবীর, বাম হস্তে ধনুক, দক্ষিণে তীক্ষ্ণ শর, (এবং তাঁহার প্রকৃতি) কোটি জলধিতুল্য গম্ভীর। অনুজ ভরত চামর ছত্র ত্যাগ করিয়া শ্রীপদপাদুকা ধারণ করিয়াছেন, শিব, ব্রহ্মা, সনক, সনাতন, শতমুখ ইন্দ্র যুক্তকরে (সম্মুখে) রহিয়াছেন। ভক্তদিগের আনন্দ উৎপাদনকারী হনুমান চরণ-কমল সেবা করিতেছেন। গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারণ করিল, হরিনারায়ণ দেব (তুল্য)।

এই হরিনারায়ণ কে? ইহা মিথিলার কোন রাজার উপাধি। শিবসিংহ ছিলেন রূপনারায়ণ, তাঁহার বংশে সকল রাজাদের নারায়ণ শব্দ-সম্বলিত উপাধির প্রথা ছিল। শিবসিংহের পিতৃব্যের নাম দেবসিংহ গরুড়নারায়ণ, শিবসিংহের পর কেহ হরিনারায়ণ, কেহ আবার রূপনারায়ণ, কেহ নরনারায়ণ, কেহ বিজয়নারায়ণ। এই গোবিন্দদাস মিথিলার কবি, পদে রামচন্দ্রের বন্দনা, ভণিতায় মিথিলার রাজার নাম।

অপর একটি পদের ভণিতা এইরূপ,—

কমলা লালিত চরণ কমল মধু
পাওএ সেই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনরাএন
গোবিন্দদাস অনুমান॥

আর এক পদে,—

গোবিন্দদাস ভন রসিক রসায়ন
রসময় ভূপতি রূপনরাএন।

নরসিংহ রূপনারায়ণ মিথিলার রাজা, শিবসিংহ ও নরসিংহ এক বংশের রাজা।

অন্য দুইটি পদে আর এক রকম ভণিতা পাওয়া যায়,—

রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভান।
রায় চম্পতি ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভান।

এই রায় অথবা রাজা চম্পতি কে? বিদ্যাপতির কতকগুলি পদেও চম্পতিপতি ও চম্পতি পাওয়া যায়। রায় চম্পতিও মিথিলেশ। ভাগলপুরে চম্পানগর নামক স্থান আছে, মিথিলার উত্তরে মতিহারী চম্পারণ জেলায়। এই প্রদেশ পূর্ব্বে মিথিলার রাজার অধীন ছিল। চম্পারণ

চম্পারণ্য শব্দ হইতে, চম্পারণ্যপতি সংক্ষেপে চম্পতি। এই গোবিন্দদাস বাঙ্গালী হইলে তাঁহার পদের ভণিতায় মিথিলার রাজার নাম কেন ?

ভণিতার অপেক্ষা ভাষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কিন্তু যে ভাষায় বিদ্যাপতি ও মিথিলার গোবিন্দদাস পদ রচনা করিতেন, সে ভাষা আমরা কয়জন বুঝি ? মিথিলায় আরও অনেক কবি এই ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তালপাতার পুথি ও হাতে লেখা পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। মিথিলার এই ভাষা কিম্বা ব্রজবুলি অজানিত ভাষা, এই ভাষার উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা অনুভব কিংবা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা অল্প লোকেরই আছে। অনেক বাঙ্গালী কবি এই ভাষার অনুকরণে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের মত ভাষা কোথায় পাইবেন ? কবিতা নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় উৎকৃষ্ট হয় না ; মিথিলার এই ভাষার মাধুর্য্যলালিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ ইহার অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কবীন্দ্র গোবিন্দদাসের ভাষা এমন মার্জ্জিত, তাঁহার শব্দের ঐশ্বর্য্য এত বিপুল যে, বাঙ্গালীর পক্ষে সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি ইনি বাঙ্গালী ও জীব গোস্বামীর প্রিয়পাত্র হইতেন, তাহা হইলে গৌরচন্দ্রিকায় ইঁহার রচিত উত্তম উত্তম পদ পাওয়া যাইত। কিন্তু গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় কোন পদ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনার সহিত তুলনা করা যায় না। তাহার কারণ, মিথিলার কবি কৃষ্ণ ও রাধাবিষয়ক পদ রচনা করেন, চৈতন্যদেবের বিষয়ে একটিও পদ রচনা করেন নাই।

চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণনার একটি পদ—

গৌররবরণ তনু শোহন মোহন
সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণ কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান॥
পেখনু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলিযুগ কলুষ তিমির ঘোর নাশক
নবদ্বীপচাঁদ উজোর॥
ভাবহি ভোর ঘোর দুহু লোচন
মোচন ভবনদবন্ধ।
নব নব প্রেমভর ররতনু সুন্দর
উয়ল ভকত সঙ্গ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীন জনে নিজ বীজ দেই তারল
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

এই গোবিন্দদাস বাঙ্গালী কবি। পদকল্পতরুতে চারি পাঁচ জন বাঙ্গালী গোবিন্দদাসের নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ইনি কে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। ভাষা মৈথিল কবিদিগের অনুকরণ, কিন্তু মূলের সহিত তুলনা করা যায় না। পদকল্পতরুতে মিথিলার কবি গোবিন্দদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে কোন একটি উদ্ধৃত করিলেই মূলের ও অনুকরণের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। যেমন,—

নব নীরদ তনু তড়িত লতা জনু
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতী বকুল বলিত অতি আকুঃ
মৌলি মিলিত বনমাল
পেখলোঁ কালিন্দীকূলবিলাসী।
হেলি কলপতরু তরুণী মনমোহন
বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী।
মণিময় অভরণ নেপুর রনঝন
মদন মন্থরগতি ভাতি।
গীম বিভঙ্গিম নয়ন তরঙ্গিম
কত কুলবতী মতি মাতি॥
কমলা লালিত চরণ কমল মধু
পাওয়ে সেই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনরাএন
গোবিন্দদাস অনুমান॥

অথবা—

চাঁচর চিকুর চূড়পরি চন্দ্রক
গুঞ্জা মঞ্জুল মাল।
পরিমল মিলিত ভ্রমরিকুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল॥
নীকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল।
মন্মথ মথন ভৌঁহজুগ বঙ্কিম
কুবলয় নয়ন বিশাল॥
বিম্বাধর পর মোহন মুরুলি
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর
সামর তরুন তমাল॥

মিথিলার এই কবি বিচিত্র ভাষাকুশলী এবং শব্দবিন্যাসে তাঁহার অপরিসীম শক্তি। অনুপ্রাসের ছটা তাঁহার পদে ছড়াছড়ি। তাঁহারই দেখাদেখি বাঙ্গালী কবিরাও অনুপ্রাস-বহুল পদ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলী যেমন স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এই কবির পদাবলীও সেইরূপ স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। মিথিলার পণ্ডিতরা এ বিষয়ে উদাসীন, কিন্তু তাঁহাদের সহায়তা না হইলে এ কাজ সম্পন্ন হয় না। তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইলে মিথিলায় যাইতে হয়, বাঙ্গালা দেশে বসিয়া কিছু করিতে পারা যায় না। কেবল বিকৃত পাঠ ও কল্পিত অর্থের সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রাচীন ধূয়া সংগ্রহ

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে নানা রকমের আলোচনা হইয়াছে। বড় বড় প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভাষাতত্ত্ব, সামাজিক তথ্য প্রভৃতি নানা দিক্ হইতে সেই সব গ্রন্থের সদ্ব্যবহার হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আমি কোন বড় গ্রন্থ বা কোন তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করি নাই। বরং এই বিষয়টি এত ছোট এবং হ্রস্ব আয়তনের যে, এ যাবৎ বাংলা সাহিত্যের কোন গবেষকের দৃষ্টি এ দিকে পতিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই।

প্রাচীন বাংলা কাব্য পড়িতে গেলে দেখা যায়, অনেক গ্রন্থে স্থানবিশেষে দুই, তিন বা চারি পঙ্‌ক্তি "ধূয়া" বলিয়া উল্লিখিত আছে। এগুলি যে গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত বা উদ্ধৃত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অথচ এগুলি প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্রুবপদের ন্যায় নহে। ক্রমে ক্রমে ইহার বিশেষত্ব ধরা পড়িবে।

আমরা এই প্রবন্ধে যে ধূয়ার কথা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ পদ বা গান নয়, প্রাচীন কাব্য গান করিবার সাহায্যের জন্য এগুলি ব্যবহৃত হইত। ধূয়াতে খুব কমই ভণিতা আছে। বড়-গুলিতেই কদাচিৎ ভণিতা দেখা যায়। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ধূয়া যত বড়ই হউক না কেন, এগুলি সম্পূর্ণ গান বা পদ নয়।

একই ধূয়া দুই তিন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থে কোন ধূয়া পাওয়া যায়, উহা সেই গ্রন্থকারের রচিত না হইতেও পারে। অধিকাংশ স্থলে উহা গায়েনরা আমদানি করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ধূয়াগুলি যেন একরূপ floating সাহিত্য, দেশের নানা জায়গায় চলিত ছিল। কোন কোন কবি বা গায়েন স্বীয় গ্রন্থে ইহাদের ব্যবহার করাতে এগুলি স্থায়ী আকার পাইয়াছে।

প্রাচীন ধূয়াগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, এগুলি যেন সেকালের referenceএর কাজ করিত। একই মনোভাব প্রকাশের জন্য শাক্ত কবি বৈষ্ণব গ্রন্থ বা ভাব হইতে ধূয়া সংগ্রহ করিয়াছেন দেখা যায়। ইহাতে কোন সম্প্রদায়-বিদ্বেষের চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে মনে হয়, বৈষ্ণব কবিরা অন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে ধূয়া লন নাই, বরং অন্য সব সম্প্রদায় (যথা, শাক্ত, শৈব, ধর্ম্মপূজক) বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে বহু ধূয়া লইয়াছেন। বোধ হয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাবপ্রকাশ ক্ষমতার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল।

ধূয়ার আকার ছোট বলিয়া উহাকে প্রবাদ বা খনার বচনের মত মনে করা যাইতে পারে না। কারণ, প্রবাদ বা বচনের ন্যায় ধূয়াতে উপদেশ বা আদেশ ব্যক্ত হয় না। ধূয়াতে অনেক স্থলে কবিত্বের ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য আছে, এবং উহাতে সুরের গতিও অনেক স্থলেই প্রকাশিত হয়।

ধূয়া সম্পর্কে একটি কথা আমার মনে হয় এই যে, অনেক সময়ে যেন উহাতে আখর দিয়া বাড়াইয়া বাড়াইয় কোন কোন পদ-গান রচনা করা হইয়াছে।

---

১০. [illegible] তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রাচীন সাহিত্যের নানা গ্রন্থে ধুয়ার নানা নাম পাওয়া যায়। মুন্সী আবদুল করিম লিখিয়াছেন,—"মাধবাচার্য্যের জাগরণে 'ধুয়া' 'বিষ্ণুপদ' নামে পরিচিত। স্থানে স্থানে 'বিষ্ণুপদ' আবার 'গোপীভাব' নাম ধারণ করিয়াছে। বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাঙ্গ-চরিতে' এই 'ধুয়ার' পরিবর্ত্তে আমরা 'ঠাঠ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি।" এই সব নাম ছাড়া অন্য কোন কোন গ্রন্থে 'মূর্চ্ছা' 'দিশা' 'ভণিতা' নাম আছে। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দ-মঙ্গলে' 'প্রতিপদ' শব্দও ধুয়া অর্থে পাওয়া যায়।

ভাবপ্রকাশের হিসাবে ধুয়া কয়েক রকমের হইত। "দশমূলরস°" (বৈষ্ণব জীবনং) নামক বাংলা গ্রন্থে আমরা এইরূপ নাম পাই,– আদ্য ধুয়া, দ্বিতীয় ধুয়া, তৃতীয় ধুয়া, চতুর্থ ধুয়া। এই গুলির সাধারণ নাম 'তাণ্ডব ধুয়া'। ইহা ছাড়া আর একটি ধুয়ার কথা পাই—তাহার নাম 'ভাব-ধুয়া'। বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক কৃষ্ণ ও বলরামমূর্ত্তি স্থাপনের সময়ে যে কীর্ত্তন হইয়াছিল, তখন যে সব ধুয়া গান করা হইয়াছিল, তাহাদের নাম এইরূপই দেওয়া হইয়াছে।

ধুয়াগুলির সাহিত্য-সৌন্দর্য্য হিসাবে বেশী কিছু না বলিলেও চলিতে পারে। উহা শুনিলেই ইহা সহজে উপলব্ধি হইবে। ধুয়ার ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সঙ্গীতের আবেগ ও ভাবঘনতা ত আছেই, অনেক ক্ষেত্রে যেন উহা আবার এক একটি ছোট চিত্রের মত আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

এই প্রবন্ধে আমি যে ধরণের ধুয়ার কথা আলোচনা করিতেছি, তাহার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। ভারতীয় সঙ্গীতের গঠনে একটি ধ্রুবপদ সকল সময়েই দেখা যায়, সুতরাং প্রাচীন বাংলা পদ-গানে বা অন্য প্রকারের সঙ্গীতেও ধ্রুবপদ বা ধুয়া থাকিবে, তাহা আমরা আশা করি বটে। কিন্তু ঠিক গান-হিসাবে রচিত না হইলেও বাংলা প্রাচীন পাঁচালী ও অন্যান্য সাহিত্যকে গান করাই হইত। প্রাচীন বাংলা পদ্য সাধারণতঃ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত হইত। ত্রিপদীকে টানিয়া টানিয়া সুর করিয়া পড়া হইত। যে জন্যই হউক, ত্রিপদীর সঙ্গে ধুয়া বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের আলোচ্য ধুয়া পয়ার-ছন্দে গ্রথিত অংশগুলির আদিতেই দেখা যায়, পয়ারকে যথাসাধ্য সুর জোগাইবার উদ্দেশ্যেই কি আগে এই ধুয়া গান করা হইত?

ধুয়ার গঠনে কয়েকটি স্তর আছে। মনে হয়, প্রথমতঃ গলার সুরটা ঠিক করিয়া লইবার জন্য ধুয়া গাওয়া হইত, পরে তাহার মধ্যে ক্রমে ক্রমে কথা আসিয়া জুটিয়াছে।

(ক) কতকগুলি ধুয়া শুনিলেই মনে হইবে, গলা ভাঁজিবার জন্য ওস্তাদেরা যেমন 'তুম্-তানা-না-না' করেন, এগুলি তা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই এগুলিতে সুরের বেগ আছে, কথার বিশেষ বাধা নাই। এ ধরণের ধুয়া জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে।

(১) কি আরে।

(২) আ রে আ হা।

(৩) ও না আয় আয়।

(৪) আরে আরে হয়।

(খ) কতকগুলি ধুয়াতে সুরেব সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটা কথা আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ধুয়া লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায়। এগুলিকে গানের পদ বলিয়া না ধরিলেই ভাল হয়।

(১) ও কি হো রে গৌরাঙ্গ জয় জয়।

(২) না হা বে আবে হয়, প্রভু রে আবে হয়।

(৩) না হারে হয় হয়, না হারে প্রাণ হয়।

(৪) মোর প্রাণ না রে আবে রে, গৌরাঙ্গ না বে হয়।

(৫) আরে আমার গোরা রে।

(৬) প্রাণধন গোরা বে আমাব প্রাণধন গোবা বে।

(৭) ও রে সুন্দর নি বে হয়।

(৮) রাম মোর সুন্দর বে, প্রাণ নাবে হয়।

(৯) ঐ আহা রে মবি বে ঐ আহা বে মবি বে।

(গ) আর এক বকমেব ধুয়ায় আমবা দেখিতে পাই, সেগুলি স্বাধীনভাবে চলিতে পারে নাই। কোন গানেব পদেব মধ্যে যে কয়েকটি মেলক আছে, তাহাদের প্রত্যেকেব শেষে এগুলিকে গান কবা হয়। ইহাকে refrain বলা যায়। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে, এগুলি উক্ত গানেব অংশ নয়। গানেব সুবকে যেন জাগাইয়া রাখিবাব জন্যই এগুলিব ব্যবহার হয়। ইহা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায়। এখানে সুব ও কথা দুই-ই আছে।

(১) আলো সজনি।

(২) রে বাছা।

(৩) ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

(৪) গৌর চলিলা।

(৫) কি আরে।

(৬) গোসাঞি।

(৭) গৌরাঙ্গ হে। ঠাঠ।—শ্রীগৌরাঙ্গেব সন্ন্যাসপটি।

(ঘ) এবার যেগুলির কথা বলিব, এইগুলিকেই প্রকৃত ধুয়া বলা যাইতে পারে। এগুলির মধ্যে কথা ও সুর মাখামাখিভাবে স্থান পাইয়াছে। আর এগুলিকে একটি কলি বলিয়া গণ্য করা যায়।

(১) আলো মুঞি গোরা রূপের বালাই লঞা মরি।

(২) মরি রে দয়াব নিধি হরি, কৃপার নিধি হরি।

(৩) চলে যেতে নার রে গোরা রে।
নবীন প্রেমের ভরে রে গোরা রে॥

(৪) এমন কেবা জানে গো এমন কেবা জানে।

(৫) মোর বঁধুয়া।
গৌর গুণনিধিয়া ॥

(৬) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পয়ারের আগে ধুয়া গাওয়ার প্রথা এতটা চল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকে যে কোন পদ্যাংশকে ধুয়া-রূপে ব্যবহার করিত, তাহার মধ্যে গানের গুণ আছে কি না, অনেক সময়েই লক্ষ্য করিত না। তাই দেখা যায়, অনেক ধুয়ায় বেশ কবিত্ব আছে, কিন্তু সে জন্য সেগুলিকে খাঁটি ধুয়া বলিবার উপায় নাই। গানের সুর আর কবিতার ছন্দ ঠিক এক জিনিষ নয় বলিয়া না বুঝিলে অনেক পদ্যাংশকে গলার জোরে গান করিয়া তুলিবার বাতিক হয়, যেমন সে কালের কথক ঠাকুরেরা নিছক্ গদ্যকে সুরে ফেলিয়া তাকে গান হিসাবে চালাইয়া দিতেন। এই সব ধুয়ায় শান্ত, করুণ, আদি, হাস্য, এমন কি, বীভৎস রসের সমাবেশ আছে। আবার অনেকগুলিতে শুধু ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়—সেগুলিকে গান করিলে রসজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় না।

(১) বসুদেব পুণ্যবান্ কৃপা কৈল ভগবান্।

(২) ওরে দাদা না মারিহ এহি কন্যাখানি।

(৩) হরি মায়া অনুসারে ব্রহ্মার মন হবে।

(৪) গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসিবেশধারী।
অখিল ভুবন অধিকারী ॥

(৫) বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগপ্রাণ।

(৬) (কি আরে) শ্যাম চামর চারু নিন্দিত চিকুর।
নিবদ্ধ কবরীভার তাহে নানা ফুল ॥

(৭) করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা স্মঙরি কান্দে সর্ব্বভক্তগণ ॥

(চ) আবার এমন অনেক ধুয়া পাওয়া যায়, যেগুলি ধুয়ার মত আকারে হ্রস্ব না হইলেও সেগুলিকে কোন গানের অংশ বলিয়াই মনে হয়। এগুলি ঠিক ভারতীয় সঙ্গীতের চলিত ধ্রুবপদের বা ধুয়ার মত—ইহারা গানের প্রথম অংশ। যখন ধুয়া হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সাধারণতঃ গানের প্রথম দুই, তিন, বা চারি পঙ্‌ক্তি মাত্রই গাওয়া হইত।

(১) না যাইয় না যাইয় বাপ আমারে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া ॥ গৌরাঙ্গ হে।

(২) শ্যামের ও রূপমাধুরী। আমি কেন পাসরিতে নারি ॥

ধুয়া-সংগ্রহ

এইবার আমরা প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ হইতে যে সব নমুনা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা বিষয় অনুসারে সাজাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। প্রাচীন সাহিত্যে পৌরাণিক উপাখ্যান ঘটিত বলিয়া

কৃষ্ণ, রাম, শিব ও দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর কথাই ধূয়াতে পাওয়া যায়। তবে বাঙলা দেশে প্রচলিত মনসা, ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতির কথা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার অনেক কথাও ধূয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণের রূপ, গুণ ও মহিমার কথা অজস্র রকমে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—

রূপ দেখিলে নয়ান ঝোরে।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

দেখবে দেখবে সুন্দর যদুনন্দনা।
ইন্দ্রনীলমণি কিয়ে এ শ্যামবরণা॥—কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ভাগবতাচার্য্য।

মহিমা তেরো কো জানে ব্রজরাজ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

কানু বড় বিনোদ নাগর।
রূপের নিছনি কত নব জলধর॥—ঐ।

বড় সাধ লাগে সে কানুরে দেখিতে গো॥—ঐ।

কানুগুণে……পরাণ।
শ্যাম বন্ধু বিনে মনে নাহি জানি আন॥—ঐ।

আমার কানাঞি গুণনিধি।
অনেক তপের ফলে মিলাইল বিধি॥—ঐ।

কার ঘরের কালিয়া চান্দ হের দেখা যায়।
চকোর চকোরী মিলি তার পাছে ধায়॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।

সখি, নন্দের নন্দনা।
চূড়ার উপর ময়ূরপাখা বিনোদ বেশে দেখ না॥
কি মোহন রূপছান্দে, দেখি রতিপতি কান্দে,
শশী জিনি মুখেরি লাবণ্য॥—ঐ।

দেখ না কানাইরে বাহির হইয়া।
একে ত চিকণকালা, গলে দোলে বনমালা,
করেতে মোহন বাঁশী লইয়া॥
যে নারীর কঠিন হিয়া, না চাহে বাহির হয়্যা,
শ্যামরূপ পড়ে উনাইয়া॥—ঐ।

কানাই, তুমি ভাল বিনোদিয়া।
নব কোটি চান্দ ফেলাই ও মুখ নিছিয়া॥
বনে থাক বনফুল দিয়া গাথ হার।
গোপীঘরে নবনী খাও ভঙ্গিমা তোমার॥
মাঠে থাক ধেনু রাখ বাঁশীতে দাও সান।
গোপালের ঘরের মণি গোপের পরাণ॥—ঐ।

কানাইরে না দেখিয়া কদম্বের তলে।
কৌতুক স্নানে গেনু যমুনার জলে॥
দূরে থাকি হেরি আমি যমুনার তীর।
জলেতে লুকায়ে আছে শ্যামের শরীর॥
ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ডোবে নাগর কমল।
বসন্ত ঋতুতে যেন রক্ত উতপল॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (ভাগবত)।
মর্ম্মকথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥—চণ্ডিকা-বিজয়, কমললোচন।
শ্যামের ও রূপ মাধুরী।
আমি কেন পাসরিতে নারি।—ঐ।
আরে সদয় হৈলা কালা যারে।
পলাইল পাপ তাপ দূরে গেল জ্বালারে॥—হরিলীলা—লালা জয়নারায়ণ সেন।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
এক জনম জাইবে সুখে॥—শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি।
ঘাম না সহে সজনি রে।
রোদে উনাইয়া পড়ে ঘাম॥—রাগনামা (পুথি)।

কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের একটু আধটু রেশ ও তার তন্ময়তা ধুয়ার ক্ষীণ আয়তনের মধ্যেও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। আবার বাঁশীর গুণই বা কত রকমে গাওয়া হইয়াছে।

ও বংশী গরজে ররজে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণদাস।
বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগ-প্রাণ॥ আলিরাজা।
বিনদ বাঁশী কে আনি দিল দেশে॥—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
শ্যামের বাঁশীরে মন মজাসুরে।
ঝরে ঝরে নয়ান ঝুরে॥ – মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
বৃন্দাবনত বাজে বাঁশী।
মনে কয় শ্যামক দেখোঁ আসি॥—ঐ।
সজনি আলো আজু মুরলী অপরূপ বাজে।
না জানি বিনোদ রায় কার তরে সাজে॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
কানাই আইল রে ভুলাইতে গোয়ালার মেয়ে।
যুবতী পাগল কৈল মুরলী বাজায়ে॥—ঐ।
আজু পরমাদ বাজে বাঁশী॥—ঐ।
ঘরেতে যাইব বল কিবা ধন লইয়া।
কানুরে দেখিতে আসু প্রাণী বান্ধা দিয়া॥

একে ত রসের কালা রসের নাগর।
বাঁশী সানে প্রাণ নিল এ না পঞ্চশর॥
চঞ্চল নয়ন করি চাহে নিরক্ষিয়া।
বাঁশী সানে প্রাণী নেয় কানু বিনোদিয়া॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

যমুনার তীরে মাধব ধীরে ধীরে
মৃদু মধুর স্বরে বেণু বাহে রে।
ইন্দুবরণী যত গোপবধূ রমণী রে
স্বগণ ত্যজিয়া বনে কেন ধায় রে॥—ঐ।

মৈলাম মৈলাম বাঁশীর জ্বালায়।
গৃহকর্ম্ম লোকধর্ম্ম রাখন না যায়॥—ঐ।

বন্ধু তোমার বদলে থুইয়া যাও বাঁশী।
তবে সে আসিবা প্রভু হেন মনে বাসি॥
এ বাঁশী যতনে থোব গন্ধ চন্দন দিয়া।
যতনেতে হীরা মণি রতনে জড়িয়া॥
যখনে তোমার তরে মরমে বেদনা করে
শোক দুঃখ নিবারিব বাঁশী বুকে দিয়া॥—ঐ।

অনুরাগের তত্ত্ব বা তার আকুলতা দু চারটি শব্দে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—কোন কোন ধুয়ায় অনুযোগের করুণ ভাবও বেশ ফুটিয়াছে।

যে বলে পিরীতি ভাল তারে নমস্কার।
এ সুখ সম্পদ সাধু নাহিক আমার॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

নব অনুরাগে প্রাণ বান্ধল রে।
আর না লয় মোর মনে॥
যখনি তখনি দিবস রজনী
পঞ্চ পরাণের সনে বান্ধল রে॥—ঐ।

আঁখি মেলিতে নারি গুরুজনের ভয়।
যে দিগে পড়য়ে দৃষ্টি সে দিগে শ্যামরায়॥—ঐ।

প্রিয় সজনি গো সই,
এ বোল বলব জানি কারে।
যে বন্ধুর লাগিয়া এত পরমাদ
সে বন্ধু ছাড়িয়া যাইতে বলে॥—ঐ।

চল ঘরে যাই আমা দোষ পরিহরি।
কালিয়া কানাইর লাগি হইনু বনচারী॥—ঐ।

মন দুঃখ সুধাইব কাহারে।
না জানি মোর প্রাণী কেমন করে॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।
কাল ভ্রমরা রে যথা মধু তথা চলি যাও।
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥
যে কথা কহিব প্রভুর ঘনাইয়া কাছে।
সুস্থির সম্ভ্রমে কেও লোকে শুনে পাছে॥
চরণকমলে শত জানাইয়া প্রণাম।
অবশেষে জানাইও রাধার নিজ নাম॥—ঐ।
রমণী মনচোরে বারেক লাগ পাইলে।
ভুজ-পাশে বাঁধিয়া সুযতন করিয়া
মন বুঝে হিয়া মাঝে থুলে॥—ঐ।
বৈদগধি বৈবিভয় পীরিতি পালন রে।
আমার করম ফলে ঐ চাঁদ মিলন রে॥
শ্রবণে শুনেছি যত বিনোদ চরিত।
কি লাগি ঘুচাও চাঁদ মুখের পীরিত॥—ঐ।
ও বন্ধু কানাই রে, জীবনধন মোর।
যুগে যুগে না ছাড়িব চরণখানি তোর॥
জাতি দিলুম যৌবন দিলুম আর দিব কি।
যার আছে সুধা প্রাণ তারে বল দি॥—ঐ।

(এই ধূয়ার পরে সম্পূর্ণ পদটি দেওয়া আছে, ইহা মাধবাচার্য্যের নিজের রচিত)।

হরি রসে আজি বাদল নিশি।
ভাবে আবেশ হৈল বৃন্দাবনবাসী॥
প্রেমে পিছল পন্থ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম ভেল পঙ্ক॥
নবঘন বরিখন প্রেমরস ধরে।
ক্রোড়ের রঙ্গিণী রাধে বিজুলি সঞ্চরে॥
যে দিকে চাহি দেখি রস অকূপার।
ডুবিল অনন্তদাস না জানি সাঁতার॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (ভাগবত)।
বন্ধু লো বন্ধু কালে কালে সব হেন হয়।
সাধিলে আপনা কাজ কার কেহ নয়॥
এ দেশে বসতি বন্ধু দেখা শুনা আছে।
না খুঁজিলে না কহিলে কেবা কারে যাচে॥

প্রথম সময়ে প্রভু কত যত্ন কৈলা।
এবে নব প্রেম পাইয়া আনা পাসরিলা ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।
কি আছে কি দিব বন্ধু প্রেম না ছাড়িও।
ও রাঙ্গা চরণে রাধার নাম লিখিও ॥
যথা তথা যাও প্রভু মনেতে রাখিও।
রাধা বলিয়া বন্ধু বাঁশীটী বাজাইও ॥—ঐ।
ঐ ভয় উঠে মনে ঐ ভয় উঠে।
শ্যাম বন্ধুয়ারি প্রেম পাছে টুটে ॥
আর ত অনেক আছে সুখের কারণ।
বন্ধু মোর সব রস জাতি জীউ ধন ॥—ঐ।
কি লাগি বাড়ানু প্রেম ছাড়ি যায়।
মরিব তোমার আগে কৈনু সর্ব্বথায় ॥—ঐ।
যাইবারে ওহে শ্যাম কেবা দিবে বাধা।
দৈবে মরিব আমি অভাগিনী রাধা ॥
সঙ্গে করি নিয়া যাও হয়্যা যাব দাসী।
ঘর প্রবেশিতে নারি না শুনিলে বাঁশী ॥
মথুরার নাগরী যেন নানা রস জানে।
গেলে না আসিবে শ্যাম হেন লয় মনে ॥—ঐ।
তোমরা মোরে না বলিও আর।
রাখিতে নারিনু কুলবধূর আচার ॥
ব্রজকুলে জন্মি আমি কলঙ্কিনী হৈনু।
জীবন থাকিতে আমি সবার আগে মৈনু ॥—ঐ।
হেন সাধ করে নাইয়র হেন সাধ করে।
হৃদি চিরি তার মাঝে রাখিতে তোমারে ॥—ঐ।
নাথ বিনে দুঃখ কহিব কাহারে।
প্রভু বিনে দুঃখ..... ......তারে ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
আজি বড় শুভদিন হে, প্রাণনাথে পাইয়া।—ঐ।
রাঙ্গা পায় কি আর বলিব আমি।
কিসের অভাব তার যার বন্ধু তুমি ॥—ঐ।
এমন কেবা জানে গো, এমন কেবা জানে।
পিরীতি ছাড়িবে প্রিয়া, না জানি স্বপনে ॥—ঐ।
কে লয়ে যায় মোর প্রাণধন কানু।
কেমনে ধরিব প্রাণ দরশন বিনু ॥—ঐ

কহিয় মাধবেব ঠাঁই।
হোলি-খেলা শ্যামব মনে নাই ॥—বাধিকার ব৷৫মাস (পুথি)।

আমা ছাড়ি গেল শ্যাম।
কে লইবে বাধাব নাম ॥—ঐ।

দারুণ মলয়াব বাও।
না জুড়ায় শ্রীবাধা গাও ॥—ঐ।

কহিয় বন্ধেব ঠাঁই।
বিরহিণী শ্যামব মনে নাই ॥—ঐ।

আমি ছিলাম বন্ধুয়াব সোআগিনী।
বন্ধুআ কব্যা গেল পবাধিনী ॥—দূতীসংবাদ (পুথি)।

আমাব গমন কালে আইল না।
আমাব মবণ কালে হইল না ॥—ঐ।

ঘোষা। মোবে কি কৈল্ল বে নন্দেব নন্দনা।
প্রাণ হবিয়া নিল বংশিবদনা ॥—বাগতালেব পুথি।
আলো বন্ধু বড সে নিঠুব তোব হিয়া।
মবিমু অবলা বাধা পিবীতে ঠেকিআ ॥—গোকুলমঙ্গল (পুথি)।
বড়াই গো, কে বলে কালিয়া ভাল।
এবে সে কালাব জানিমু ব্যভাব
অন্তব বাহিবে কাল ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
কৃষ্ণের ব্রজলীলাব নানা দিক্‌ও ধুয়াব মধ্যে ধবা পডিযাছে।
সুদাম ঘবেতে যাও ভাই বে
এখন না বহিও বৃন্দাবনে।
ধেনু না পাইলে মায়ে মাবিব এখনে ॥—মাধবাচার্য্যেব চণ্ডী (জাগবণ)।
গোপাল চলিল মাঠে চালাইয়া ধেনু।
বিশাল নিশান চলে বাজে মোহন বেণু ॥
ধেনু চালাইবাবে বলাই আগে যায়।
তার পাছে কানাই যেন নীল মেঘ যায় ॥
শিশু পশু চলি যায় অনেক সন্ধানে।
কানাই কালা বলাই দাদা চাঁদের সমানে ॥—ঐ।
আজু বড় আনন্দ গোপাল ঘরে আইল।
ব্রজের বালক সব নাচিতে লাগিল ॥—ঐ।

নন্দঘোষ ভাগ্যবান্ জাব পুত্র ভগবান্ হে।—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

অরে আজ তৃণাবর্ত্ত আইল গোকুল নগবে।

অরে ভাই, ভাই॥—ঐ।

হবি মায়া অনুসাবে ব্রহ্মাব মন হবে॥—ঐ।

কাল্যা মেঘে কৈল অন্ধকার।

কানাই বেড়িয়া কান্দে যতেক বাখাল॥—ঐ।

ধৈর ধৈব রাম ধৈব রে॥

সাত বৎসবের হবি। একলা ধৈবাছে গিবি॥

ঐ মনে ভয় আছে। গিবি ভাঙ্গিয়া পড়ে পাছে॥

তোমবা বাছাব সখা। সিঙ্গা বেণু দে বে ঠেকা॥—ঐ।

ঘোষা। উদ্ধব হে জাও তুমি গোকুল নগবে।—উদ্ধবসংবাদ (পুথি)।

আজি মেঘে কৈল অন্ধকাব।

চিনিতে না পাবি তাই তনু আপনাব॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

ব্রজ ও গোকুলেব সঙ্গে ব্রজদুলালেব সম্পর্কও ধুয়াব মধ্যে পাওয়া যায়! ব্রজবাসীব সুখ-দুঃখেব কথাও আছে। ব্রজেব জন্য ভক্ত-বৈষ্ণবেব কি আগ্রহই না স্থানে স্থানে ফুটিয়া উঠিযাছে।

আইজ বড আনন্দ গোকুলে।—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

অবে ব্রজবাসীব সুখ জত।

এক মুখে কব কত॥—ঐ।

আব কবে বে জাব বৃন্দাবনে।—ঐ।

বাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।

ব্রজে যাইব আপন সুখে॥—শ্রীগৌবাঙ্গেব সন্ন্যাসপটি।

কৃষ্ণেব মাথুব-লীলাকে বৈষ্ণবেরা যে চোখে দেখিতেন, তাহাও ধুয়াব মধ্য দিযা বুঝিতে পারা যায়।

কানাঞি বড বঙ্গিঞা নাগর।

মথুরা যাবেন মনে প্রফুল্ল বিস্তব॥—ভাগবত, অচ্যুতদাস।

শুন সজনি গো কানাই মথুরা যাইবেন নিশ্চয়।

নিজ প্রাণ রাখিতে মোরে হইল সংশয়॥—ঐ।

মধুপুবী জাএ বাধার বন্ধু হে,

না জানি কপালে কিবা আছে।

পাইআ যুবতী নব মধু হে,

অলি হইআ রহে কালা পাছে॥—সাবদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন।

ফির হে, রাধার মাধব ফিব হে।

তুমি মথুরাকে যাবে। ব্রজ-বধূব কি হইবে॥

কাল তুমি কি বলিলে। অখন কেনে পাসরিলে॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

শ্যাম মধুপুরে বৈল।

কান্দি আমাব জনম গেল॥—বাধিকাব বাবমাস (পুথি)।

বাধা ও তাঁহাব সখীদেব নিয়াই কৃষ্ণলীলাব কাববার, তাই বাধাব রূপ, গুণ ও নানা অবস্থাব কত বকমেব কথাই যে ধূয়াতে স্থান পাইয়াছে, তাহাব ঠিক নাই।

বিনোদিনী ওগো বাই।

লোটন দোলায়ে যাও পিঠে॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

বিনোদিনি বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।

তুয়া পন্থ নিবক্ষিতে বহিয়াছে প্রাণনাথে

বাধা বলি মুবলী বাজায়॥—মাধবাচার্য্যেব চণ্ডী (জাগবণ)।

কহ কহ কলাবতী কাহে বে পয়ান।

ঐ রূপভাজন জন কেমন পুণ্যবান্॥—ঐ।

জয় রাধা ঠাকুরাণী প্রেমবিলাসিনী বাই।

ও অঙ্গ বয়ান কত চান্দে।

রূপ হেবি মৃগপাখী বিনাইযা কান্দে॥

ঘামে তিতিল তনু মন্দ মন্দ ঝবে।

কোটি চাঁদ জিনিয়া বাধা মুখ শোভা কবে॥—ঐ।

দিশা। বিনোদিনী বাই।

গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে যাই॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

(কি আবে) শ্যাম চামব চারু নিন্দিত চিকুব।

নিবদ্ধ কববীভাব তাহে নানা ফুল॥—বামায়ণ, অদ্ভুতাচার্য্য।

বাধা ও কৃষ্ণেব লীলা-বিলাস অতি সংক্ষিপ্তভাবে ধূয়ায় গাওয়া হইয়াছে।

কুঞ্জবনে, বলি কুঞ্জবনে।

বাধা রসময়ী শ্যাম সনে॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

বাধা কানু দু'জনে সরস রসকেলি।

ববণে বরণে ব্রজবনিতা সকলি॥—ঐ।

চল সখি বৃন্দাবনে যাই।

বৃন্দাবনে কানাইর সনে বজনী গোঞাই॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগবণ)।

রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে।

বসন্তে প্রেমরসে সুখে বিরাজে॥—কবিকঙ্কণচণ্ডী।

ছেলের জন্ত মায়ের মনের নানা রকমের ভাব ধুয়ায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অযোধ্যার কৌশল্যা, বৃন্দাবনের যশোদা ও নবদ্বীপের শচীমাতার ভাবনা ও বেদনার সুর এইগুলির মধ্যে গাথা পড়িয়াছে।

পাঁচ বৎসরের যাদু ধেনু লইয়া যায়।
কেমনে ধরাব প্রাণ অভাগিনী মায় ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
যাদব আমার দুগ্ধের ছাওয়াল।
কেমতে হাটিয়া যাবে অতি শিশুকাল ॥—ঐ।
তোমরা নি মোর যাদব দেখিয়াছ।
সোনা বান্ধা বাঁশীরব কি না শুনিয়াছ ॥
অরুণ উদয় কালে　　গো ধেনু লইয়া চলে
　　লবনী খুজিল মায়ের আগে।
মুই অভাগিনী শুনি　　উত্তর না দিলাম পুনি
　　কোন দিগে গেল যাদু রাগে ॥—ঐ।
আজি গহিন বনে যাইও না।
অভাগী মায়ের প্রাণ লইও না ॥—ঐ।
হায় হায় হায় রাম হায় কি না হব।
তুমি বনে গেলে আমি কেমনে থাকিব ॥—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলী।
বাছা নীলকমলে রে।
কেমন কৈরে অতিথের সঙ্গে যাও ॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
মায়র দুই নয়নর তারা রে।
আরে ও বাছা আমার কেবা লইল রে ॥—ঐ।
বিয়ানে গিয়াছে যাদু রে।
রবির ঝালয়ে মৈল্ল আমার বাছা রে ॥—ঐ।
আজ কেন চঞ্চল মন।
না জানি কি হৈল বনে দুঃখিনী-জীবন ॥—(১) ভাগবত, শ্যামদাস।
　　(২) গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
ওরে মোর যাদব দুলালিয়া।
রাতুল চরণে বনে কেমনে যাবে ধাইয়া ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
আমার কানাঞি গুণনিধি।
অনেক তপের ফলে মিলাইল বিধি ॥—ঐ।
কান্দিয় না বাছা কান্দিয় না।
তোমা ধন বই　　আর কেহো নাই
　　আর দুঃখ দিও না ॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

শুন ওহে নন্দরায়। আনন্দ বহিয়া যায়॥
যত মনে সাধ ছিল। মা বলিঞা পূরাইল॥
জনমে জনমে কত। কবিল কঠিন ব্রত॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

না যাইয় না যাইয় বাপ আমারে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া॥ গৌরাঙ্গ হে॥
—চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস।

গৌব আয় আয় আয়।
তোমাবে দেখিলে মোর পরাণ জুড়াএ॥ বে গৌর আয় আয় আয়॥
—চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ।

কৃষ্ণেব নাগবালি বা ঢামালিকেও কবিবা ধুয়াব বর্ণনীয়রূপে ধবিয়াছেন,—

যশোদা গো তোর যাদু বড়ই ঢামাল।
তুমি কেমন করিয়া বল দুগ্ধের ছাওয়াল॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

কত রঙ্গ জান হে কানাই।
তোমার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণে জীব নাই॥—ঐ।

আপনারে কত বড বাস হে কানাই।
অসম্ভব কহ যে শ্রবণে শুনি নাই॥—ঐ।

চল চল নিলাজ কানাই, কলসী লাগিল কাঁখে।
গোকুল নগরে বসতি বাধাব, গুরুজন পাছে দেখে॥—ঐ।

হেদে হে নন্দেব পো, এতেক চাতুবী কাবে।
অব্যবহাব কথা কেন কহ বাবে বাবে॥—ঐ।

কত না জান রে তুমি নাগবালি বেশ।
কালা যদি গোরা হইত না থুইত দেশ॥—মাধবাচার্য্যেব চণ্ডী (জাগবণ)।

চিকণ কালা বে সই দেখিতে যাবা কে।
নিবক্ষিতে নারীরূপ মেঘেব আড়ে থাকে॥
কালা নহে গোরা নহে কেবল শ্যামময়।
হাটিয়া যাইতে হেলি ঢলিয়া পড়য়॥—ঐ।

বরি বে বিনোদ নাগর কানু।—ঐ।

বড়াই মাই লো গাও মোর কেমন কেমন করে।
তথনে বলিলুম আমি না জাইমু কদমতলে রে॥—ঐ

দুতি গো কি মতে বাহির হমু।
দুখর কথা কাইল সকালত নিরলত কমু॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

যমুনায় কর পার সুজন কাণ্ডারী।
অলপে ডরাই মোরা অবলিনী নারী॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

নননদিনী রস-বিনোদিনী ও তোব কুবোল সহিতাম নাবি।—আলওয়াল।
আজু ঘরে যাই সব তোমাবে ব্যতীত।
কাহারে কহিব দুঃখ কে যাবে প্রতীত॥—মাধবাচার্য্যেব চণ্ডী (জাগবণ)।

ব্রজলীলা ভিন্ন ভাগবতেব অন্য দুটি একটি কথাও ধূয়াব মধ্যে পাওয়া যায়,—

বসুদেব পুণ্যবান্ কৃপা কৈল ভগবান্॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।
ওরে ত্রিজগৎ মাঝে বসুদেব ভাগ্যবান্ রে ভাই॥—ঐ।
ওবে দাদা না মারিহ এহি কন্যাখানি॥—ঐ।
হবি মায়া অনুসারে ব্রহ্মাব মন হবে॥—ঐ।

সাধাবণ ভাবে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার কাছে ভক্ত-কবিবা প্রাণের আবেগ জানাইয়াছেন,—

কি আব কহিব রাঙ্গা পায়।
চবণে শবণ দিয়া রাখহ আমায়॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
আজি বড দুঃখ উঠে মনে।
ভজিতে না পানু বাঙ্গা দুখানি চবণে॥—ঐ।
চবণে শবণ দিয়া বাখ এইবার।
জীয়নে মরণে আমি তোমাব তোমাব॥—ঐ।
আপনা কবি চবণে বাখ হে দয়াল॥—ঐ।
ভালি ভালি বে ঠাকুব দেখি লইনু শবণ।
ফল ফুল ছায়া কেন কবহ বঞ্চন॥—ঐ।
আমাব বল কি হবে উপায়।—মাধবাচার্য্যেব চণ্ডী (জাগবণ)।
দীননাথ অনাথেব নাথ।
কি আর বলিব আমি মনেব মানস।
কি কহিব কি না জান তুমি অভিলাষ॥
আমি ভজিলু তোমা　　কহিবা কি মনে আছে।
পতিত পাবন নামে লাজ পাবা পাছে॥—ঐ।
আর নাহি তরিবার তরে, জগত-দুর্ল্লভ এই কথা।
জগতে যাবত জীও　　শ্রবণ ভবিয়া পিও
　　তবু না ছাড়িও গুণগাথা॥—ঐ।
আর ভরসা নাই রে বিনে বাঙ্গা পাএ।—মোহমুদ্গর-চরিত (পুথি)।

অনেক কবি ইষ্টদেবতাকে ভক্তি করা অপেক্ষাও শমনের ভয়েই বেশী ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ আবার মানবজন্ম ব্যাপারে ব্যর্থতা বা ভবসমুদ্রের ঢেউয়ের ভীষণতা মনে করিয়া কাতর হইয়াছেন। কেহ দুর্ল্লভ মানবজন্মের গুণগানও করিয়াছেন। বিধাতাব নিদারুণতার কথাও আছে। দুনিয়াদারির দিক্দারিতেও অনেকে—হিন্দুর ন্যায় মুসলমানও ব্যস্ত হইয়াছেন।

তোমার সেবক করি রাখ মোরে হরি হরি
এবার উদ্ধার যতুনাথে।
দারুণ যমের ভয় প্রাণ মোর স্থির নয়
তোমা বহি নিবেদিব কাতে ॥—
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ভাগবতাচার্য্য।

রাধাকৃষ্ণ বলি বল রে ভাই পরম আনন্দ হৈয়া।
কেমনে তরিবে এ ভব সাগরে
ভজ সাধুসঙ্গে বৈয়া ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

বড় রে দয়ার নিধি হরি।
এ ভব-সমুদ্রে বিষম ঢেউ
তুমি তরাইলে তরি ॥—ঐ।

হেদে রে ভকত ভাই রাধাকৃষ্ণ বলহ বদনে।
হেলায় জিনিয়া যাবে দারুণ শমনে ॥—ঐ।

হরি বল রে ভাই এইবার।
হেন সাধ করেছ মনে মানব হবি আর ॥—ঐ।

বল হরি নাম, বড় ধন।
ধন জন সুত দার যারে কর আপনার
সে তোমার ভুলাইছে মন ॥—ঐ।

রাম পরম ধন জপ নারে।
শিয়রে শমনভয় দেখ নারে ॥
কত আর এ জীবনের আশ দিন কত কেবল পরবাস
পরলোকে হইবে দরশন।
যৌবন জীবন ধন অকারণ দেখ যেন নিশির স্বপন
দ্বিজ মাধবের এই বিরচন ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)

আমার নাকি এমন দিন হবে।
গঙ্গার জলে যাইয়া পাপ তনু মজাইয়া
হরিবোল বল্‌তে বল্‌তে প্রাণী যাবে ॥—ঐ।

ওরে প্রাণ ভাইয়া রে।
হরিবোল বলিতে বলিতে নৌকা বাহ না রে।—ঐ।

ও বিধি বড় নিদারুণ ॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

আর সাদ নাই রে ভাই ভারতভূমিতে গতাগতি।
পথে কারা বান্ধে ঘর রামদাস রথী ॥

অনেক যতনে হাট মিলাম্নু পসার।
ছাড়ি যাইতে ফিরি চাইতে হল ছারখার ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
বাণিজ্যে ভেল মেরা গোবিন্দের নাম।
ভাবহু পরম পদ রহি একু ঠাম ॥
আরের বাণিজ্যে ভাই লবঙ্গ সুপারি।
আমার বাণিজ্যে ভাই বল হরি হরি ॥
নয়ান তেরছ তব বয়ান প্রসারি।
হরি জীউ নাম তোমা লই ফিরি ফিরি ॥
বাণিজ্য লাগিয়া তবে দ্বারিকায়ে যান।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লইয়া রাম নাম ॥
যে বনে থাকয়ে সিংহ বাঘ বাটোয়ারা।
ছো বনে পামছঁ রাম নাম রাখোয়ারা ॥
কহে কবি মাধু গোবিন্দ মেরো সাথি।
আওত যাওত না পুছে বাত জগাতি ॥—ঐ।

[এটি কি মাধবাচার্য্যের নিজের রচিত ধুয়া ?]

দিশা। দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম আর হবে না।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
মিছা ভুল্লাই কর বান্দা রে।—ঐ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

নিজের দেবতাকে অন্য দেবতা অপেক্ষা বড় করিয়া দেখাইবার লোভও দুই এক জায়গায় প্রকট দেখা যায়।

কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শিব নাচেন গান দুর্গা দিয়া করতালি ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

ধুয়াতে হরি বা নারায়ণের নানা রকমের গুণ-গান আছে ; ভক্তের নানা রকমের বাসনার কথাও প্রকাশিত হইয়াছে,—

নারায়ণ প্রভু দেহ হে শরণ।
তুমি সে কারণ প্রভু আমি অকারণ ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
যে করিবে হরি তুমি সে জান।
পদছায়া দয়া বারেক কিন ॥—ঐ।
হরিকথা (নাম) বড়ই মধুর।
শুনিলে শ্রবণসুখ পাপ যায় দূর ॥—ঐ
হরি কি গতি আমার।
দেহ পাইয়া না ভজিলাম চরণ তোমার ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

চরণে শরণ নিনু গোপাল রে।
এবার উদ্ধার কর হরি মোরে॥
ডুবি রহিনু দেখ ভব-সাগরে।
এমন বান্ধব নাহি পার করে মোরে॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
হরি বহি ঠাকুর নাই সভার আগে বলি।—ঐ।
বৈরি ভাব হৈয়া রৈল দারুণ শেল বুকে।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম না লইলাম মুখে॥—ঐ।
হরিপদ পাব কত দিনে রে ভাই॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।
নন্দনন্দন হরি ভজিলে সে পাই॥—ঐ।
হরি বোল মুগুধা হরি বোল রে।
যাহে নাহি হয় শমন-ভয় রে॥—চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস।
দিশা। হরি বোল রে বল হরি বল।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
কিবা করে লীলায় অ হরি লীলায়।
পঙ্গু লঙ্ঘে ধরাধর নদী তরে শিলায়॥—হরিলীলা, লালা জয়নারায়ণ সেন।

রামচন্দ্রের গুণও ধুয়ায় গাওয়া হইয়াছে। তাঁহার লীলার কোন কোন ঘটনার উল্লেখও ধুয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

শুক নারদ মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায়॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
কে জানে রামের গুণ।
বেদে দিতে নারে সীমা॥—ঐ।
কি ভাব আমার মন ছাড়িয়া রামের কথা।
আর কি এমন হবে জন্ম যায় বৃথা॥—ঐ।
হেদে রে ভাবুক ভাই, রাম নাম পিয় দিবানিশি।
যেথানে রামের নাম সেথানে বারাণসী॥—ঐ।
ভাল বীর রাম রাজা ওরে হয়।—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
রাম মোর সুন্দর রে প্রাণ নারে হয়।—ঐ।
রাবণ বের হও, লঙ্কা বেড়িল রঘুনাথে।
দেব জিনি বন্দী হইবা মানবের হাতে॥—ঐ।
করুণাসাগর রাম নাম।
লইতে রামের নাম বিধি হৈল বাম॥—ঐ।
জানে রাঘবে জানে কিরে আনে কি জানে।
অনুক্ষণ রাম রাম ধ্যানে জ্ঞানে সেই নাম
জপিলে কি জানিয়ে পরাণে॥—ঐ।

হায় হায় হায় রাম হায় কি না হব।
তুমি বনে গেলে আমি কেমনে থাকিব ॥—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলী।
কি মধুর রামনাম বাণী।
নিরবধি রাম নাম শুনি ॥—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড
(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১০০৯ সালের পুথি)।
জয় রঘুনন্দন রাম দণ্ডধারী।
ভুবনমোহন রাম রূপের মাধুরী ॥—ঐ।
লহ রে রামের নাম এইবার এইবার।
মরিলে মানবদেহ না হইব আর ॥—ঐ।
অনাথে তোমারে ডাকে প্রভু রাম কোথা গেলা।
এ ভবসংসার তরিতে রাম-পাদপদ্ম বান্ধ ভেলা ॥—ঐ।
রাম দণ্ডধারী।
তোমার নিছনি লয়্যা মরি ॥—ঐ।
হেদে গো দারুণী মা রামকে পাঠালি কেন বনে।
আমি আর জীব নাঞি গো রামের বিহনে ॥—ঐ।
রঘুবংশতিলক রাম অহে রাম কি গুণে তরিব ভব-মায়া।
দয়া কর রামচন্দ্র তুয়া রাঙ্গা চরণে দেহ ছায়া ॥—ঐ।

রামায়ণ সম্পর্কিত কথাও অল্প স্বল্প ধুয়ার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

রাবণ বের হও লঙ্কা বেড়িল রঘুনাথে।
দেব জিনি বন্দী হৈবা মানবের হাতে ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

শিবের গুণ-গান ও তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ধুয়ায় খুব কম পাওয়া গেলেও একেবারে বাদ যায় নাই।

অএ ভোলানাথ রে হএ।
শিব শিব স্মর মনে জে হএ সে হএ ॥—সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন।
আমার নাকি এমন দিন হবে।
হরগৌরীর চরণপদ্ম পুনঃ কি দেখিবে ॥
এ পাপ তনুখানি গঙ্গাতে মজিবে।
হরি বল বলিতে পরাণী যাবে ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

দুর্গা বা কালীর নিকটেও ভক্তের আবেদন নিবেদন আছে।

মহামায়ের মহিমা অপার।
তুমি সে তোমারে জান কে জানিবে আর ॥—সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন।

ভক্ত পিয় রে ভবানীর নাম-মাধুরী হে।
জেন পদ্মে ভ্রমরের চাতুবি হে ॥—সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন।
মজিল আমার মন-ভ্রমবা কালী-পদ-নীল-কমলে ॥—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
দেবী জননী গো মা তুয়া পদপঙ্কজ সাব।
এই তিন ভুবনে চাহিলাম মনে মনে
তুয়া বিনে গতি নাহি আব ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
আজি জগতজনে শ্রীদুর্গা দেখহ।
কোটি কোটি জনমেব সাফল করহ ॥
বস্তুসিংহাসন করি উপবেশী দেবী।
হেন লয় মোর মনে ও চরণ সেবি ॥—ঐ।
আমার দুঃখে দুঃখে গেল দিন।
দয়া কব দয়াময়ী জেনে দীনহীন ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
বোল মুখে কালী বৃথায় দিন যায় রে বহিয়া ॥—কবিকঙ্কণের চৌতিশা।

গঙ্গাব মহিমা প্রচারের জন্যও ধুয়া লেখা হইয়াছে,—

গঙ্গে ত্রিভুবনতাবিণী।
অলস-কলুষ-তাপ-পাপ-বিমোচিনী ॥—হরিলীলা, লালা জয়নারায়ণ সেন।

গৌবাঙ্গদেবের রূপ, গুণ, ভঙ্গিমা ও মহিমা ভক্ত কবিদের কাছে কবিত্বের উৎসস্বরূপ হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি ছোট আকাবেব গৌরচন্দ্রিকার কাজ করিয়াছে।

ভাল নাচে বে গৌরাঙ্গ বঙ্গিয়া।
যেন হেমকিরণিয়া ললিত লাবণিয়া
রসভরে করে ডগমগিয়া ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
বহ রহ বলে বে নদীয়ার লোক বৈরাগ চলিলা দিনমণি।
কেমতে ধরাইবা প্রাণ শচী ঠাকুরাণী।
আগম পুরাণ পোথা নিয়া বাম করে।
করঙ্গ বান্ধিল গৌবা কটির উপরে ॥
নিজপুর হইতে গৌরাঙ্গ নদীতীবে যায়।
আউলাইয়্যা মাথার কেশ শচী পাছে ধায় ॥—ঐ।
এ হেন গৌরাঙ্গচাঁদ শচীর নন্দন।
বিরস বদন হয়্যা রহিল তখন ॥—ঐ।
দেখ না গৌরাঙ্গচান্দের বাজার।
ভক্ত তরিবার তরে সুরধুনী নদী তীরে
প্রেমময় রতন পসার।

যত ব্রজ-সখীগণ   দেখ গিয়ে কৃষ্ণধন

চাঁদমুখ হের একবার ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ) ।

দেখ গোরাচাঁদের বাজার ।—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস ।

ভালি ভালি রে গোরাচাঁদ ।

পতিত-পাবন বট তুমি ॥—ঐ ।

বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া ।

গোরার নিছনি লঞা মরো যেন রূপগুণের বালাই লঞা ॥

—চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাস ।

জগতজীবন গোরাচাঁদ ।

অখিল জীবের মন, করাইল চেতন,

বান্ধল দিয়া প্রেমফাঁদ ॥—ঐ ।

অবতার অরে ভাই রে ভাই ।

গোরাচাঁদ বিনে দয়াল আর নাই ॥—ঐ ।

হেদে গো মানিনি গো ।

গোরাচাঁদের গুণ রহিল ঘুষিতে ॥—ঐ ।

চলে যেতে নার রে গোরা রে ।

নবীন প্রেমের ভরে রে গোরা রে ॥—ঐ ।

ভাল নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া ।

প্রেমভরে ভেল ডগমগি হিয়া ॥ —ঐ ।

ও না আয় আয় ।

কি লাগি কান্দে মোর গৌরাঙ্গ রায় ॥—চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ ।

প্রেমধন রতন পসার ।

দেখ গোরাচাঁদের বাজার ॥—চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস ।

হরি বলি গোরা পঁহু নাচে বাহু তুলি ।

জগ-মন বান্ধল করুণ বোল বলি ॥—ঐ ।

নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি ।

অসাধনে চিন্তামণি হাথে দিল বিধি ॥—ঐ ।

চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে ।

বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে ॥

হরি রাম রাম রাম ॥—ঐ

গৌর এ পরম দয়াল ।

ধন্য ক্ষিতি ধন্য অবতার ধন্য কলিকাল ॥—ঐ ।